চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের শিল্পরূপ

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের শিল্পরূপ

"শিল্প হল মানুষেরই করা কোন বস্তু"

- ১

সৃষ্টির অপার রহস্য মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে তার চিন্তা ও চেতনায়। এই ফুটে ওঠার মধ্যেই গঠন আঙ্গিকে সত্যতা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই বলতে পারি, মানুষের সৃষ্টিশীল জড় সত্য যখন কল্পনার দ্বারা সজীব ও বাস্তব জীবনের অনুভবে সর্বদা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তখনই মানুষের শিল্প সত্ত্বা বিকশিত হয়ে ওঠে। মানুষ স্বভাবশিল্পী বলেই জগৎ ও জীবন তার রূপে রসে মানব সত্ত্বার অলৌকিক প্রতীকে মুক্ত করে দেয় তার সৃষ্টি কর্ম। এই সৃষ্টি কর্মই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। তাই মানব মনের জিজ্ঞাসাই হলো সাহিত্য শিল্পের জিজ্ঞাসা। তাইতো সত্যেন্দ্রনাথ রায় এই শিল্প ও শিল্পীর সম্পর্কে যথার্থভাবে বলেছেন -

"জীবনকে তাঁরাই দেখতে পান যাঁরা মনে মনে জীবন থেকে একটু সরে দাঁড়াতে পারেন। যাঁরা তা পরেন তারাই শিল্পী। তাঁরা যা পরিবেশন করেন, তা অবশ্যই বানানো। কিন্তু বানানো মিথ্যা নয়, বানানো সত্য।" - ২

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন -

"সব শিল্পেই কালের সত্য আর তথাকথিত কালাতীত সত্য, দুই সত্য এক সঙ্গে মিশে প্রায় একাকার হয়ে থাকে।" - ৩

তাই সাহিত্যের মধ্যে অন্তর বাহিরের সকল স্থান ও কালের সীমা পেরিয়ে এক অপরূপ সৃষ্টি রূপ দান করে। লেখক শুধু নিজেকেই সাহিত্যে রূপদান করে না, মনুষ্যত্বের সার্বিক ও চিরন্তন প্রকাশকে সাহিত্যে তুলে ধরে। তবে সাহিত্য শুধু মানব সত্ত্বার অভিব্যক্তি বহন করে না। মানুষের চিন্তা চেতনা ও ভাবনাকে লেখক রচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করেন। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় -

"যাকে জগৎ বলি, জীবন বলি, তাও সাহিত্য। যা শিল্প বা সাহিত্য নামে পরিচিত, তা জীবনেরই বিশিষ্ট প্রকাশ। তা অনুকরণ নয়, স্বাধীন সৃষ্টি। তবে, তাকে জীবনের রূপায়ণ বলতে কোন বাধা নেই।" - ৪

এই জীবনকে ছুঁয়ে যায় সমাজ, সুতরাং এই সমাজকে সাহিত্য শিল্পে অস্বীকার করা যায় না। সমাজের শৈল্পিক প্রতিফলন না ঘটলে সাহিত্যের পরিপূর্ণতা আসে না, যা সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘাত, বিকাশ ও বিবর্তনকে শিল্প রূপ প্রদান করে। আবার শিল্প জিজ্ঞাসা নিয়ে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছেন -

"শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে অনুকরণ " - ৫

কিন্তু অনুকরণ নিজে সত্যের প্রতিমূর্তি। সত্যের মধ্যে থেকেই শিল্পের জন্ম হয়। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল এই মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে কাব্য শিল্প হৃদয়বৃত্তিমূলক কল্পনার প্রধান সৃষ্টি এবং তার উপাদান হল রূপ ও ভাববস্তু।

তবে অ্যারিস্টটলের ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা একমত হয়েছেন। তিনি যে কোন ধরনের সাহিত্যের সৃষ্টিকে শিল্প হিসাবে দেখার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ শিল্প মনের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন সাহিত্যে অবশ্যই মানুষের কথা থাকবে। সাহিত্যিক মানুষের সুখ দুঃখের দ্বারাই হোক, আবার প্রকৃতি বর্ণনা করেই হোক - নিজেকে সে প্রকাশ করবে। সুন্দর নয়, শান্তিময় নয়, মহৎ নয়, যার মধ্যে মানব ধর্ম নেই, তা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের কথা স্মরণ করতে পারি -

"সাহিত্যে মানুষ কেবল যে আপনার ভাবের প্রাচুর্যকেই প্রকাশ করে থাকে তাহা নহে, সে আপনার প্রকাশ শক্তির উৎসাহ মাত্রকেই ব্যক্ত করিয়া আনন্দ করিতে থাকে। কারণ প্রকাশই আনন্দ। সাহিত্যেও মানুষ কতো বিচিত্র, তবে নিয়ত আপনার আনন্দ স্বরূপকে অমৃত রূপকেই ব্যক্ত করিতেছে তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়" - ৬

মানুষের এই সার্বিক প্রকাশ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আলাদা ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কাব্যে যেভাবে জীবনকে দেখা যায়, উপন্যাসে ঠিক সেভাবে নয়। কবিতায়

মানুষের ইমেজ একভাবে আসে আবার উপন্যাস বা গল্পে ঠিক সেভাবে আসে না। তবে একথা বলতে পারি যে, উপন্যাস হল মানুষের জীবন আলেখ্য। জীবনকে নিয়ে উপন্যাস। জীবনের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি উপন্যাসে ফুটে উঠতে দেখি। তবে এ কথা ঠিক যে গোটা জীবনের ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে দিলেই উপন্যাস হয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গ্রহণ বর্জন প্রয়োজন। গ্রহণ বর্জনের দ্বারা মানুষের জীবনের ঘটনাকে একটা পাটার্ণ বা ছকে বিন্যস্ত করে তোলাই ঔপন্যাসিকের প্রধান কাজ। এই কাজ কোন বাঁধা ছকের নিয়মে আসে না। লেখকের প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির সুগভীর পর্যবেক্ষণ থেকেই আসে। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"আর্টিষ্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর-সেগুলির মধ্যে গ্রহণ-বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশ মত। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে কোনোটাকে কমাতে। কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন করে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ করে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।" - ৭

এই বিষয় প্রকাশ করতে গিয়ে এসে পড়ে উপন্যাসের ফর্ম। কারণ কাহিনী বা ঘটনা শুধু উপন্যাসে থাকে না। তার সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত থাকে। সুতরাং আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের সামগ্রিক বিষয় ও আঙ্গিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই বলতে পারি উপন্যাস যেন একটা শরীর। কাজেই অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে তার অঙ্গশৈলীর কথা। কাহিনী, চরিত্র, লেখকের কথনভঙ্গি, সংলাপ, জীবন দর্শন, সময় ও দৃষ্টিকোণ- এগুলি উপন্যাসের প্রধান শর্ত। তবে ঐ বৈশিষ্ট্যের সবকটি উপন্যাসে সার্থকভাবে রূপায়িত হবে এমন ভাবা ঠিক নয়। উপন্যাসে সময়ের বা কালের একটা বড় ভূমিকা আছে। সমাজের সামগ্রিক রূপ, কালের বিবর্তন আমরা উপন্যাসে দর্পণের মত দেখতে পাই। সেখানে ব্যক্তির সংঘাতময় জীবন ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপন্যাসে ফুটে ওঠে।

শুধু সমাজিক জীবনই নয়, উপন্যাসের প্লট, সংলাপ ও চরিত্র গঠনে শিল্পরূপের চূড়ান্ত রূপ ধরা পড়ে। তবে সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে পারে যদি লেখকের প্রকাশগুণ থাকে। এই প্রকাশের মাত্রা যুগের প্রচলিত নিয়মকে কেন্দ্র করে সবসময় গড়ে ওঠে না। তা রাজনৈতিক, সমাজ জীবনের দ্বন্দ্ব, সংঘাতময় মুহূর্ত বিশেষ করে যা

মানুষের মনে রেখাপাত করে সেই ঘটনাগুলির রূপ তুলে ধরাই লেখকের কর্তব্য। লেখকের শিল্প শৈলীর কুশলতার উপরেই এই ঘটনাগুলি বাস্তব হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আর্ণষ্ট ফিসার এর মতকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে, মৌলিক শিল্প সব সময়ই তার সমকালের মতাদর্শের সীমাকে ছাড়িয়ে যায় এবং মতাদর্শ যে বাস্তবকে আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখে, সেই বাস্তব সত্যকে দেখার অর্ন্তদৃষ্টি আমাদের দান করে।

উপন্যাসের এই বাস্তবতা নিছক জাগতিক বাস্তবতায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। তা উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রকে বর্তমানের উপযোগী করে চিহ্নিত করতে হয়। চরিত্রের বাস্তবতাই হল উপন্যাসের বাস্তবতা, যা চরিত্রের আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় ঔপন্যাসিকের কুশলী সংলাপের মধ্যে দিয়ে। তখন আমাদের সামনে চরিত্রটি জীবন্ত মানুষ হয়ে ওঠে। সাহিত্যকে তাই বলতে পারি কুশলী নির্মাণ ও সামাজিক চেতনার ফসল। তার সঙ্গে লেখকের ভাষা শৈলীর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। সুতরাং লেখক সে সময়ের পটভূমিকার স্বরূপটি ভাষার মধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। সে সময়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার লেখার মধ্যে উঠে আসাই স্বাভাবিক। কারণ যুগের ধারায় প্রচলিত হয় উপন্যাসের নর-নারীর বিচরণের নিশানা। সময়কালের কোন ঘটনাকেন্দ্রিক উৎস কেন্দ্র থেকে লেখক কুলের যাত্রাপথ ঐ নিশানা ধরে চলতে থাকে। উপন্যাসের এই প্রকৃত যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী, প্লট, ঘটনা, চরিত্র, উপকাহিনী ও বিষয় ভাবনা কথাসাহিত্যের প্রতিমা হয়ে উঠেছিল। উপন্যাসের এই প্রতিমা গড়তে তিনি দেশী বিদেশী সাহিত্যের আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের কথনে এসেছিল নাটকীয় ভঙ্গি। বঙ্কিমচন্দ্র যে উপন্যাসের নূতন সম্ভাবনার পথ তুলে ধরেছিলেন অবশ্য তার অনেক পরে উপন্যাসের শিল্প আঙ্গিকে বৈচিত্র্য দেখা যায়। উপন্যাসের রূপ ও রীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যা ছিল ক্রমশঃ তার পরিবর্তন ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কল্লোলীয় লেখকদের আগমন ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক পরে কথাসাহিত্যের আঙ্গিকে একটা বড় পরিবর্তন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রথম দিকে যে আঙ্গিক ও বিষয়ভাবনা কাজ করেছিল শেষের দিকের উপন্যাসে তা দেখা যায় না। তিনি সচেতনভাবে উপন্যাসের বিষয় ভাবনার মধ্যে একটা নূতন রীতির বেশ পরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তে যা দেখা গেল "রাজর্ষী" উপন্যাসে তা দেখা যায় না। "চোখের বালি" উপন্যাস বাংলা উপন্যাস জগতে প্রকরণের নূতনত্ব এনেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের প্লট, ঘটনা ও চরিত্র অঙ্কনে তিনি

সচেতনভাবে পূর্বসূরীদের রীতি ও ভাষাকে শিল্পের অঙ্গনে আনার অভিপ্রায় দেখান নি। কথাসাহিতের লেখকের অভিজ্ঞতা সবসময় এক থাকে না। যুগের পরিবর্তনে তার বিষয়ভাবনা ও শিল্প কুশলের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তন উপন্যাসের আঙ্গিকে সমানভাবে লক্ষণীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কল্লোলে প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক ও কল্লোল সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের শিল্প কৌশলে নূতনত্ব এসেছিল। তবে তাঁরা সচেতনভাবে আঙ্গিক চেতনার পরিবর্তন আনতে অনাগ্রহী ছিলেন। অনেকটা যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজ ব্যাবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে তাদের শিল্প কৌশল দেখা গিয়েছিল। বঙ্কিমের অনেক পরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বঙ্কিমীয় রীতি, আদর্শ ও আঙ্গিক ভাবনার কিছু নূতনত্ব লক্ষ করা যায়। তারাশঙ্করের "ধাত্রিদেবতা", "গণদেবতা", "পঞ্চগ্রাম", "কালিন্দী" উপন্যাসের প্লট গঠনে ও চরিত্রের সমস্যা রূপায়নে বঙ্কিমীয় রীতি কিছুটা অনুসরণের ছাপ দেখা যায়। আবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে অলৌকিকতা ও রোমান্টিক রীতি লক্ষ করা যায়। বিভুতিভূষণের কল্পনাপ্রবণ মানসিকতা গল্পের ভাষাকে ও বাস্তবকে অনেকটা রোমান্টিক মোড়কে বাঁধতে চেয়েছিল। তাই তাঁর "দেবযানী" উপন্যাসে যে রীতি অবলম্বন করলেন "আদর্শ হিন্দু হোটেল" ও "আরণ্যক" উপন্যাসে বিষয় ভাবনা ও রীতি সেইভাবে উঠে আসে নি। প্রকৃতি তাঁর উপন্যাসের সর্বাঙ্গে অবস্থান করেছে। ফলে চরিত্রগুলি বাস্তবতা পেলেও খানিকটা রক্ত-মাংসের মানুষের পরিপূর্ণতা থেকে দূরে ছিল। আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রে একটা দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। তিনি উপন্যাসের কাহিনী ও আঙ্গিক ভাবনায় বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি চরিত্রগুলির মধ্যে বাস্তবতার নীরিখে হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম প্রকাশে সচেতন ছিলেন। তাঁর উপন্যাসে জীবনের কামনা বাসনার দিকটি খুব সচেতনভাবে উপন্যাসে উঠে এসেছিল। উপন্যাসের সংলাপে যেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠ সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। যার ফলে গল্পের চরিত্রগুলি আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। তিনি তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত, সহজ ও সাবলীল বাকরীতি দিয়ে উপন্যাসে গতি এনেছিলেন। যেমন "পুতুলনাচের ইতিকথা" উপন্যাসের প্রথম বাক্যেই দেখতে পাই -

"সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল- অনাহারে মৃত্যু"। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি অশ্লীলতার ঝাঁঝ থেকে খানিকটা দূরে জটিল জীবনের দ্বন্দ্বে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আর এই ভাবনা তাঁর শিল্পী মনের ভিতর থেকে এসেছে। তা উপন্যাসের কাঠামোয় তিনি তুলে ধরেন। যেমন- "অনেকে বিশ্বাস করে না, তবু জীবনের একটা

চরম সত্য এই যে, সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতির মূল ভিত্তি জীবনী শক্তির দ্রুত অপচয়- ব্যক্তিগত অথবা সঙ্গবদ্ধ জীবনের।"- ৮

কল্লোল কালের লেখকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে একটি আবেগ আনতে চেয়েছিলেন। এই আবেগ ছিল বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ঝলমলে দীপ্তিতে মেশানো। তিনি উপন্যাসে একটি তীর্যক ও ধ্বনিময় শিল্প চাতুর্য এনে কাব্য ঘেঁষা সংলাপে চরিত্রের অন্তলোক উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধকালীন মানুষের হতাশাগ্রস্ত জীবন তাঁর উপন্যাসের শৈলীতে ফুটে উঠেছিল। তাঁর "কাক জ্যোৎস্না", "প্রথম প্রেম", "আসমুদ্র", "প্রাচীর ও প্রান্তর" ইত্যাদি উপন্যাসে গদ্যরীতি রোমান্টিক ভাবনায় চরিত্রগুলি রূপায়িত হতে দেখি। এই রোমান্টিক ভাবধারার আরেক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর উপন্যাসের গদ্যরীতির ভাবধারা উচ্ছল ও প্রাণবন্ত হয়েছিল। নাগরিক সভ্যতার নর-নারীর দেহ চেতনার দিকটা তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য পেল। উপন্যাসে যুদ্ধকালীন সমাজে মানুষের বীভৎসতা ও কুৎসিত রূপ তাঁর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। নর-নারীর কামনা, বাসনার মধ্যে একটা জীবন্ত অথচ কৃত্রিম পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের সংলাপ ও ভাবধারা আপাত দৃষ্টিতে কৃত্রিম হলেও তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সময় প্রবোধকুমার স্যান্যাল উপন্যাসের শরীরের মধ্যে দিয়ে চরিত্রের মনোলোকের ছবি তুলে ধরেছিলেন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যও খানিকটা স্বতস্ফূর্ত ও স্বপ্রতিভ বলে আমাদের মনে হয়। তিনি চিন্তাকে শিল্পের নিখুঁত স্তরে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। কল্লোলকালের এই সব তরুণ কথসাহিত্যিকদের রচনায় বিদেশী লেখকদের ভাবধারা বিশেষভাবে কাজ করেছিল। শিল্প চাতুর্য, বাক্য ও শব্দ ব্যবহারে উপন্যাসে একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিল। এই সব তরুণ লেখকদের উপন্যাসের গঠন রীতিতে একটা দৃঢ়তা ও সাবলীলতার ভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলিতে শিল্পশৈলী কিভাবে উঠে এসেছে তা আলোচনা করবো।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের শিল্পরূপ আলোচনা করতে গিয়ে প্রাথমিক একটা সমস্যা আমাদের কাছে হাজির হয়। বুদ্ধদেব বসু শুধু উপন্যাসই লিখতেন না, শুধু গদ্যশিল্পীই ছিলেন না, অনেকে তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয় কবি বলে মনে করেন। সুতরাং কবিদের লেখা গদ্যরীতি প্রচলিত গদ্য লেখা থেকে আলাদা চেহারার হবে একথা অস্বীকার করা যায় না। একজন ঔপন্যাসিক যেমন যুক্তিতর্ক - বুদ্ধি ও ব্যাখ্যার অর্থভেদী

শব্দবাণে চরিত্রকে পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলেন, তেমনি কবিরা কবিতার মোহিনীশক্তি বা বাস্তবতার লাবণ্যে পাঠকের হৃদয়কে দখল করতে চান। এই দুটি সাহিত্য শাখার সাড়া জাগানোর কাজ যে আলাদা, আমরা সাহিত্য আলোচনায় তা বুঝতে পারি। তবে আপাত দৃষ্টিতে আলাদা মনে হলেও কবিরা অনুভবের শৃঙ্খলে লিখতে থাকেন। তাই বুদ্ধদেবের লেখায় এল কোমলতা মেশানো শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন চরিত্রের পায়ে কোন বেড়ি পরায় না। তারা প্রাণের লাবণ্যে উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

তবে এ কথা ঠিক যে, কোন কবি যখন উপন্যাস লেখেন তখন তার চরিত্রগুলি গদ্যের যে পোষাক পরে থাকে, একজন খাঁটি ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে তা না হতেও পারে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে তাই চরিত্রের সংলাপ যেন প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে কোন অজানা জগতে পৌঁছোতে চেয়েছিল। বুদ্ধদেবের গদ্য সংলাপ যেন পাঠকের মনে এক সংবেদী আবেগ সৃষ্টি করে। তাই প্রচলিত উপন্যাসে বুদ্ধদেব যে গদ্য ব্যবহার করেছেন তা সচরাচর অন্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দেখা যায় না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, কবির লেখা গদ্য সংলাপ এবং ঔপন্যাসিকের লেখার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব একই বন্ধনীতে আলোচনা হতে পারেন। বাকীদের গোত্র আলাদা। রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব দুজনেই গদ্যে স্বচ্ছতা, সাবলীলতাকে নিজের করে এঁকেছেন। অনেক সময় এদের উপন্যাসের মধ্যেও কাব্যিকতার ইমেজ চলে এসেছিল। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের উপন্যাসে সব সময় আমরা একটা অনুভবী দৃষ্টি দেখি। তিনি চরিত্রের সংলাপের মধ্যে দিয়ে কিছু আবিষ্কার করার যেন চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে কবিত্ব যেন চরিত্রের অন্তঃলোকে প্রবেশ করার অন্যতম হাতিয়ার। কারণ তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি অধিকাংশই কবি ও সাহিত্যিক। যা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে খুব কম লেখকের রচনায় এই রকম সাহিত্যিক নায়ক নায়িকাদের দেখা যায়। যেটা বুদ্ধদেবের উপন্যাসে খুব স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসে এই সাহিত্যিক চরিত্রগুলি এসেছিল। সুতরাং বুদ্ধদেব উপন্যাসের ভাষায় শব্দ, বর্ণ ও অর্থের মধ্যে ভারসাম্য ও মতামতের দৃঢ়তা এবং বাক্য-অনুচ্ছেদ পরম্পরার ব্যাখ্যা যথার্থ বলে মনে হয়। কবিতা সুলভ ভাবনা ও নায়ক নায়িকাদের কল্লোলীয় চেতনার আন্দোলন তাঁর উপন্যাসে দেখা যায়। কল্লোলকালের লেখকদের উপন্যাসে সমাজ জীবনের বাঁধাধরা ছক থেকে অনেক দূরে একটা নূতনত্বের আঙ্গিক ভাবনা এসেছিল। তাই কল্লোলের যে আন্দোলন শুধু

উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে ছিল না, ছিল শিল্পরূপে। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জানিয়েছেন-

"কল্লোলের বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রেও। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়।"- ৯

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী লেখকদের উপন্যাসে ভাষার যে অজস্র উপমার উপস্থিতি দেখি, বুদ্ধদেবের উপন্যাসে তা দেখি না। বুদ্ধদেব যেন চলমান সাহিত্য জগতের যে আন্দোলন চলছিল সেই আন্দোলনে উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদেরও সামিল করেছিলেন। দেশীয় কালচার অপেক্ষা বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসের সংলাপে ইংরাজী শব্দ, বিদেশী কবিদের ইংরেজী কবিতার পঙক্তি ব্যবহার করতে দেখি। উপন্যাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজে যে প্রতিমা গড়ার কাজে বুদ্ধদেব ব্যস্ত ছিলেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে উপমা রূপক, চিত্রকল্প অলঙ্কার একান্ত সাধারণ পরিবেশ থেকে আনেন নি, তা এসেছিল লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতার আলো থেকে। যার ফলে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিম পরিবেশে মানানসই হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে সামাজিক রূপ বিন্যাসের ছাড়পত্র সবসময় পেয়েছিল, যার ফলে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা উচ্চশিক্ষিত। একেই বুদ্ধদেবের উপন্যাসের শিল্পরীতির বিশিষ্ট্য লক্ষণ বলা যেতে পারে। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলি এসেছিল সমকালীন কল্লোলীয় চেতনা থেকে। তাঁর উপন্যাসে সাম্যবাদী আদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। মানুষের জীবনের জৈব ধর্ম যে একটা প্রবল সত্য তা উপন্যাসে দেখা যায়। এই জৈবিক চাহিদাগুলি সুপ্ত মনের চাওয়া পাওয়ার বিশেষ দিকগুলি উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে মানুষের চিরন্তন যৌন চেতনার সাক্ষ্য নর-নারীর জীবনের মধ্যে দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন। এই বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে কলকাতা নগরী বুদ্ধদেবের উপন্যাসে চলাফেরায় প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। তিনি প্রচলিত যে ধারাকে সে সময় ফেলে এসেছিলেন,- তা আরোহন করেন নি। বুদ্ধদেব বসু কোন মান বা মডেলকে অনুসরণ করে উপন্যাস রচনা করেন নি। কিন্তু দেশি বিদেশি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রূপরীতির ক্ষেত্রে বিদেশী লেখকদের প্রভাব পড়েছিল। তাঁর উপন্যাসে ক্রুস্ত, ভার্জিনিয়া, উলফ, ম্যাসমান প্রভৃতির লেখকদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর ভঙ্গি সর্বদা গল্প করার। বিভিন্ন চরিত্রের সমবেশ ঘটিয়ে তিনি যেন আপন মনে গল্প বলেছেন। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষদের সহজেই তিনি বিচরণ করাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন।

বুদ্ধদেব উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ সংখ্যার ও ক্ষমতার দিক দিয়ে বেড়ে ওঠা, তাদের মানসিক যে পরিবর্তন দেখা যায় সেই দিকটা তুলে ধরেছেন। যার ফলে বুদ্ধদেব উপন্যাসে চরিত্রগুলির মধ্যে সবসময় একটা হতাশা ও নিঃসঙ্গতার ছাপ রেখেছেন। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে দেহ গঠনের রীতি একান্ত নিজস্ব। তিনি স্বল্পসংখ্যক চরিত্র নিয়ে উপন্যাসের প্লট গঠন করেছিলেন। অবশ্য বুদ্ধদেব শেষের দিকের উপন্যাসে শিল্পভাবনার নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের "সাড়া" উপন্যাসে কল্পনার যে বিস্তার ও যৌনতা, দেহ মিলনের পূর্বাভাস দেখি, শেষের দিকের উপন্যাসে তা ছিল না। ফ্রয়েডীয় চেতনা তাঁর "সাড়া" উপন্যাসে কাজ করেছিল। যার ফলে তাঁর উপন্যাসে বাস্তব জগৎ থেকে অনেক দূরে একটি কল্পনার শৃঙ্গে নায়ক নায়িকাদের বিচরণ করতে দেখা যায়।

বুদ্ধদেবের উপন্যাসে এক বা একাধিক উপকাহিনী নেই। তিনি উপকাহিনী যোগে প্লটকে জটিল করে তুলেছেন বলে মনে হয় না। চরিত্রগুলির কথাবার্তায় বুদ্ধদেব খেলার সঙ্গী ও বাল্য স্মৃতির কথা বার বার বলেছেন। সংলাপে ছোটগল্পের পরিমিতি বোধ কাজ করেছে। ঘটনার বিস্তৃত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পক্ষপাতী ছিলেন। এর সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে রোমান্স, প্রেম ও কামনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। বুদ্ধদেব দেহ কামনার চূড়ান্ত মুহূর্ত দেখানোর আগেই উপন্যাসের পরিণতি দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেব কোলকাতা কেন্দ্রিক জীবন, কোলকাতার বিভিন্ন মহলকে উপন্যাসের প্লটে এনেছেন। ঘটনা বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সতর্ক। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের কায়িক অবয়ব তাই ছোট।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে বর্ণনা অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রে কখনও রোমান্টিক আবেগ বিস্তৃত ও গভীরতর কোন উদ্দেশ্যেই এসেছে। অকারণ কবিত্বও উপন্যাসে অনেক সময় এসেছিল। সরল উপাদানকে তিনি উপন্যাসে গ্রহণ করে চরিত্রের স্বভাব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে তা যেন জটিল হয়ে উঠেছিল। তাঁর উপন্যাসের বিষয় হিসাবে সাহিত্য প্রেমিক মানুষদের কথা দেখা যায়। তাদের দেহজ কামনা বাসনার মধ্যে দিয়ে নিঃসঙ্গতার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যার ফলে তাঁর

উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতার দিকটি ফুটে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসে যে বিষয়গুলি একাধিক বার এসেছে তা হল -

(১) চিঠি ও ডায়েরী লেখা, (২) স্বপ্ন, (৩) বৃষ্টি, (৪) সাহিত্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, (৫) সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা, (৭) ইংরেজ কবি ও লেখকদের আলোচনা, (৮) বারবণিতা চরিত্র, (৯) বখাটে চরিত্র, (১০) হতাশা (১১) পত্র বিনিময় (১২) রূপ বর্ণনা (১৩) ভ্রমণ, (১৪) অতি লৌকিক উপাদান।

বুদ্ধদেবের দৃষ্টিকোণে শিল্পরূপের বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তিনি শুধু দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনে একই বিষয়বস্তুর স্বাদ আস্বাদনের জন্য উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে তিনি ততটা সতর্ক ছিলেন না। তিনি উপন্যাসের কোন বিষয়ে সোজাসুজি আলো ফেলতে চান নি। কোন মৌলিক ভঙ্গিতে বিশেষ দিক দিয়ে আলো ফেলতে চেয়েছেন। তিনি প্রচলিত কোন বিশেষ যৌনতা লাভের ফ্রেমে মানুষকে বার বার পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু কোলকাতার নাগরিক জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। দেখার এই রীতিটি কবির দৃষ্টিতে উদার যৌবনের আবেগ মিশ্রিত চোখ দিয়ে। তিনি মনের ভিতরে আলো ফেলে জীবনের আকাশকে আলোকিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। যৌন জীবনকে আসক্তিতে লিপ্ত করা তাঁর যেন অভিপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই আসক্তির মাঝেও তাঁর আদর্শ কোথাও লঙ্ঘিত হয় নি।

বুদ্ধদেব বসু যে আঙ্গিক উপন্যাসে এনেছেন তার বেশির ভাগই প্রেম বিষয়ে। প্রেমের পরিণতি বেশিরভাগ উপন্যাসে দেখা যায় না। বিধবা বিবাহ প্রসারে তার অন্তরের অপরিসীম স্বীকৃতি ছিল। তার এই ভাবনা বিভিন্ন উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। তাঁর উপন্যাসে আত্ম-ভাবনা ও আত্মজিজ্ঞাসার কোন আকস্মিক ঘটনার তাড়না দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনা করা হলো ঃ

১) গীতি কাব্যিকতা ও নারী মনের উপলব্ধি উপন্যাসের প্রারম্ভিক কয়েকটি অধ্যায়ে রয়েছে কিন্তু চরিত্রগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হতাশায় ধুঁকছে।

২) উত্তেজনাময় ঘটনা ও পরিবেশ তৈরীতে লেখকের কল্পনার জগৎ কৃত্রিম ভাবে এসেছে। বুদ্ধদেব বসু পরিবেশগত কোন বাহ্যিক ঘটনা বা প্রকৃতি যেন কোন উপাদান এনে যোগ করেন নি।

৩) উপন্যাসে নর-নারীর প্রেম নিবেদনের স্থান হিসাবে বুদ্ধদেব বসু কোলকাতা শহরকে বেছে নিয়েছিলেন। কোলকাতার মানুষের জীবন যাত্রা, কামনা, বাসনা, মনের আবেদন ও অবচেতন মনোভাব বুদ্ধদেব বসুর শিল্পে নৈপুণ্যের সঙ্গে এসেছিল।

৪) ভালোবাসার অন্তসারশূন্যতার কথা বুদ্ধদেব তাঁর প্রেমের উপন্যাসে দেখিয়েছেন। প্রেম থেকে বিরহের কোন আকর্ষণ তাঁর উপন্যাসে তেমনভাবে দেখা যায় না। শুধু "বিশাখা" ও "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসে এই বিরহের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

৫) বুদ্ধদেব বসু প্রেমের উপন্যাসে বলার ভঙ্গি, কথোপকথন ও বিষয়বস্তুতে সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য লিখনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সাহিত্য আলোচনার বিষয় হিসাবে দেশি, বিদেশি লেখকদের স্থান দিয়েছেন।

৬) নাট্যরসের কিছু উপাদান বুদ্ধদেবের এই প্রেমের উপন্যাসে দেখা যায়। "মন দেয়া-নেয়া"উপন্যাসে নায়ক তার বন্ধুদের দ্বারা নিজ প্রেমিকার সঙ্গে দেহ বিনিময়ের দৃশ্য দেখা যায়। এছাড়া বুদ্ধদেবের উপন্যাসে নির্লজ্জভাবে নায়ক-নায়িকারা প্রিয়জনকে জীবনসঙ্গিনী না করে যৌন খেলায় মেতে উঠতে দেখা যায়।

৭) প্রেমকে বুদ্ধদেব বসু অবিবাহিত যুবক যুবতীর ক্ষেত্রে সম্মোহন মূলক ভঙ্গি নিয়ে এবং দাম্পত্য প্রেমের ক্ষেত্রে অবৈধ প্রণয় দেখিয়েছেন কিন্তু তার পরিণতি সম্পর্কে কোন আভাস উপন্যাসে দেখা যায় না।

৮) বুদ্ধদেব বিশ্লেষণ রীতিকে কয়েকটি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। মুখ্য চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে দাম্পত্য প্রেমকে দেখিয়েছেন। অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের ক্ষেত্রে অনেক চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ্য করি।

৯) বুদ্ধদেব প্রেমের উপন্যাসে চরিত্রগুলি আত্মভাবনাশ্রয়ী। প্রাত্যহিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্রগুলি বড় হয়ে ওঠে নি। এছাড়া চরিত্রের সমন্বয়ের কোন কার্যকর ভুমিকা উপন্যাসে দেখা যায় না। স্বাধীন ভঙ্গি নিয়ে চরিত্রগুলি রচিত।

১০) বুদ্ধদেব বসু প্রেমের উপন্যাসে চরিত্রগুলির মনের সুপ্ত আকাশে একটি নূতন রীতি দেখিয়েছেন তবে এই নূতন রীতি চরিত্রের আকাশে অনেক সময় অধরা থেকে গেছে। চরিত্রগুলি ভাবুক প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। চরিত্রগুলি প্রেমের ব্যাপারে ছিল অভিনব। বুদ্ধদেব দৃষ্টিভঙ্গির জটিল চিন্তার জালে, সাময়িক অনুশাসনে উপন্যাসের চরিত্রদের মরতে দেন নি।

এবার বুদ্ধদেবের সমগ্র উপন্যাসকে বিভিন্ন রীতিতে ভাগ করে আলোচনা করবো।

১) তৃতীয় পুরুষের জবানীতে রচিত উপন্যাস

যবনিকা পতন, রডোডেনড্রন গুচ্ছ, অদর্শনা, হে বিজয়ী বীর, মন দেয়া-নেয়া, নির্জন স্বাক্ষর, হাওয়া বদল।

২) প্রথম পুরুষের জবানীতে রচিত উপন্যাস

যেদিন ফুটলো কমল, পরিক্রমা, পরস্পর।

ক) নাট্যরীতি সংমিশ্রণ

বিশাখা, দুই ঢেউ এক নদী

খ) পত্র বিনিময় ও ডায়েরী রীতি

অকর্মণ্য, এক বৃদ্ধের ডায়েরী

গ) আত্ম কথন রীতি

সাড়া, সানন্দা, একদা তুমি প্রিয়ে, লাল মেঘ, পরস্পর, ধূসর গোধূলী, বাড়ি বদল, অনেক রকম, অসূর্যাম্পর্শা, সূর্যমুখী, চৌরঙ্গী, পাতাল থেকে আলাপ

৩) বর্ণনা ও বিবৃতি প্রধান রীতি

ক) তৃতীয় পুরুষের জবানীতে

আয়নার মধ্যে একা, প্রভাত ও সন্ধ্যা।

খ) লেখকের জবানীতে

মৌলিনাথ, নীলাঞ্জনের খাতা, আমার বন্ধু, শেষ পাণ্ডুলিপি।

গ) প্রথম পুরুষের সরাসরি উক্তি

ধূসর গোধুলী, বিপন্ন বিস্ময়

৪) চেতনা প্রবাহ রীতি

ক) কালো হাওয়া, শোনপাংশু, রুকমী।

খ) চলিত বাক্ রীতি

বাসর ঘর

৫) বহু কথন রীতি ঃ

মনের মতো মেয়ে, তিথিডোর।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের শিল্পরূপেকে বিভিন্ন রীতিতে ভাগ করার পর এবার আমরা বিভিন্ন রীতির উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে দেখবো।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের পটভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঢাকা এবং কোলকাতা; বিশেষ করে কোলকাতার সমকালীন নাগরিক জীবন তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছিল - একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা সাহিত্য সাধনায় ব্যস্ত ছিল। এই সব বিষয় তাঁর উপন্যাসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের পটভূমিতে মানুষেরা এসেছিল মধ্যবিত্ত জীবন থেকে। তারা সকলেই শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়। কেউবা ইংরাজী কালচারে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের জীবনের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজ করেছিল। বুদ্ধদেব তাঁর উপন্যাসে কোলকাতার মধ্যবিত্ত নগর জীবনের মানুষের চলার দুরন্ত গতিকে স্থান দিয়েছিলেন।

১) তৃতীয় পুরুষের জবানীতে রচিত উপন্যাস

এই পর্বে "যবনিকা পতন", "রডোডেনড্রন গুচ্ছ", "অদর্শনা" উপন্যাসগুলি আলোচিত হচ্ছে। এই পর্বের উপন্যাসে জীবনের যে রূপ প্রকাশিত তা লেখকের ভাবুকী ঘটনাবলী দিয়ে সাজানো। "যবনিকা পতন" উপন্যাসে তৃতীয় পুরুষের জবানীতে লেখক গোটা ঘটনাটির বর্ণনা তুলে ধরেছেন। অমিয়, মৃগাঙ্ক ও ইন্দ্রজিৎ এই তিনটি পুরুষ চরিত্র এঁকে উপন্যাসে যেন একটা জটিল প্যাটার্ণ তৈরী করেছেন। এখন আমরা এই উপন্যাসের গঠন শৈলী নিয়ে আলোচনা করবো।-

বুদ্ধদেবের "যবনিকা-পতন" (১৯৩১ খ্রীঃ) উপন্যাসে শিল্প নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে যে কাহিনীকে বুদ্ধদেব নির্বাচিত করেছেন তা খুব প্রশংসার বিষয় নয়। যৌন লালসা তাড়িত বখাটে চরিত্র অমিয়কে উপন্যাসের কাহিনীতে রূপ দিয়েছেন। এই চরিত্রের মধ্যে জীবনের ঘটনা একই ভাবে দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসে দেখি মানুষ কখনও জীবনে স্বাধীন ভাবে চলতে পারে না। লেখক বিভিন্ন সাহিত্যিক বন্ধুদের সমস্যা ভিন্নধর্মী চরিত্রের মনে একটি পৃথক রূপ অঙ্কন করেছেন। এই সত্যকেই বুদ্ধদেব বসু "যবনিকা পতন" উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। দেহ চেতনা ও কাব্য চেতনার আকর্ষণের তীব্রতা তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব "যবনিকা পতন" উপন্যাসের দেহ চেতনার ঘটনাকে তিনটি খণ্ডের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

প্রথম খণ্ড ঃ দুই বন্ধু - তিনটি পরিচ্ছেদ।
দ্বিতীয় খণ্ড ঃ অঞ্জলি বসুর প্রেমোপাখ্যান - তিনটি পরিচ্ছেদ।
তৃতীয় খণ্ড ঃ অতি পুরাতন বিরহ-মিলন কথা - চারটি পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধদেব এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় ঘটনাতে এনেছেন অমিয়কে। অমিয় পৌরসভা অফিসের কর্মী। অমিয় ও মৃগাঙ্ক দুজনের গোপন চরিত্রালাপ উপন্যাসে প্রধান ঘটনা। অমিয় ধনী সন্তান হলেও বুদ্ধদেব বসু তাকে এই উপন্যাসে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র হিসাবে দেখিয়েছেন। কারণ বুদ্ধদেব ভালো-মন্দের ছবি অঙ্কন করেন নি, তাই ভালো-মন্দের বিচার এই চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় না।

এই উপন্যাসে নাটকীয় রীতিতে সংলাপ রচিত হয়েছে। অমিয়ের মধ্যে বাসনা, লোভ, হিংসা, ঈর্ষা দেখিয়েছেন। অমিয়ের হিংসার অনল এতই প্রখর ছিল যে বন্ধু মৃগাঙ্ককে হত্যা করতে সে দ্বিধাবোধ করে নি। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যসে দেহ চেতনা ও যৌন চেতনায় নারী-পুরুষেরা কেমনভাবে বিচরণ করে তার ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মোটকথা বুদ্ধদেব বসু নারীদেহ ভোগ এবং দেহ বিনিময়ের চূড়ান্ত রূপ এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

বুদ্ধদেব উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছদে সুরার দোকানে অমিয় চরিত্রের বীভৎসতা তুলে ধরেছেন। প্রথম থেকেই অমিয় বখাটে উদ্ভট মাতাল চরিত্র, অন্যদিকে মৃগাঙ্ক নীরব, নীরেট প্রেমিক পুরুষ। সবসময় সাহিত্যকে মূলধন করে তিন-তিনটি মেয়েকে সে প্রেম নিবেদন করেছিল।

"যবনিকা পতন" উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রকে নিয়ে ও চরিত্রগুলির কথোপকথন নিয়ে সমান্তরাল ও কৌণিক বিন্যাসের যে জটিল প্যাটার্ণ তৈরী হয়েছে, তা অমিয়, মৃগাঙ্ক ও ইন্দ্রজিতের জীবনের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই ঘটনাবলী বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নীচে দেওয়া হলো।

চরিত্রগুলির নাম	উপন্যাসের প্রথম খণ্ড	উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড	উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড
ছায়াময়ী	দাম্পত্য জীবন	অঞ্জলী বোস , মৃগাঙ্ক ও ছায়াময়ীর পরিচয়	মৃগাঙ্ককে ভৎর্সনা
অঞ্জলী বোস	সাহিত্যিক, স্কুল শিক্ষিকা	মৃগাঙ্কের মাধ্যমে অমিয়ের সঙ্গে পরিচয়	অমিয়ের সঙ্গে দেহ বিনিময়
অমিয়	কর্পোরেশন অফিসের কেরানী ও মৃগাঙ্কের বাল্য বন্ধু	ছায়াময়ীর সংসারে প্রবেশ করে অঞ্জলীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা।	মৃগাঙ্ককে খুন ও হতাশা
মৃগাঙ্ক	সাহিত্যিক	অঞ্জলী বোস প্রেমের সাড়াতে নিস্পৃহ	অমিয়ের বাড়িতে প্রতিবাদ, ও পরিণামে খুন

এই উপন্যাসে চরিত্রগুলির কোন ব্যক্তিত্ব নেই। এই উপন্যাসের পটভূমি কোলকাতা ও ঢাকা শহর। এছাড়া উপন্যাসে কলেজ, হোস্টেল, চিড়িয়াখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী, রেস্টুরেন্ট, ধর্মতলা, শিয়ালদহ, পার্কস্ট্রীট, চৌরঙ্গী প্রভৃতি স্থানের পরিচয় বার বার এসেছে। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। এই উপন্যাসে অমিয় প্রথম থেকে জীবনের অর্থ করেছিল -

"লোকে পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করে অবসরের আশায়, উপভোগের উদ্দেশ্যে- আমোদ আনন্দ, হাস্যমুখর, স্ববান্ধব সন্ধ্যা; সুন্দর মেয়ের, বুদ্ধিমান পুরুষের সাহচার্য, শৈল শিখর, সমুদ্রতীর; ভালো বই পড়া, ভালো গান শোনা- এক কথায় যাকে বলি জীবন।" - ১০

আবার বন্ধু ইন্দ্রজিৎকে হত্যার পর এই চরিত্রের কোন মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। সে বলেছে -

"এমন বোকা, এমন বোকা ! কেন মাথাটা কি একটু সরিয়ে নিতে পারে নি?" - ১১

বুদ্ধদেব "অদর্শনা" (১৯৪৪ খ্রীঃ) উপন্যাসের কাহিনীতে সরোজ পালিত নামে এক সাহিত্যিকের মধ্যে দিয়ে প্রেমের ভিন্ন রূপ তুলে ধরেছেন-

"ঐ মধুর স্বর যার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হলো সে যে কে তা কি বলে দিতে হবে ? আপানারা নিশ্চই অনুমান করতে পেরেছেন সে-ই কালীতারা চৌধুরী।" - ১২

নাদেখা গানের প্রেয়সীকে ভালোবাসতে গিয়ে লেখক কালীতারার সঙ্গে মালবিকা নামে আরেকটি নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রেমের দ্বন্দ্ব ও রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। সরোজ পলিত রূপে নয়, সত্যকার গানকে ভালোবাসতে গিয়ে গানের প্রেয়সী তার কাছে অন্য মূর্তি নিয়ে ধরা পড়ে। উপন্যাসের এই অংশে লেখক দুটি গোপন রহস্য তুলে ধরেছেন। যা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অভিনব।

"আমার একটা কথা জানবার বাকি আছে। তুমি ছদ্মনামে গান গাইতে কেন, বলো তো? মুখ থেকে হাত সড়িয়ে কালী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কেন বোঝো না ? না। আমার গান শুনে যাদের ভালো লাগবে, আমাকে দেখে তারা মর্মাহত হোক সেটা আমি চাইনি। সেইজন্য মালবিকার আড়ালে আমি নিজেকে লুকিয়েছিলাম।" - ১৩

কালীতারা ও মালবিকার গানের এই গোপন চুক্তি লেখক উপন্যাসের শেষ অংশে দেখিয়েছেন। কালীতারার কুৎসিত রূপের মধ্যে দিয়ে এক অভিনব গায়িকা রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটলো। উপন্যাসের শেষে মালবিকা চরিত্রটির কোন পরিপূর্ণতা লেখক দেখান নি। যেহেতু সরোজ পালিত গানকে ভালোবাসে তাই গানের প্রেয়সীর সঙ্গে মিলন দৃশ্য দেখিয়ে লেখক উপন্যাসটি শেষ করেছেন। কৌতুহলপূর্ণ সংলাপ উপন্যাসে আলাদা বৈচিত্র্য এনেছে। যেমন একটি সংলাপে দেখতে পাই

"প্রথম যখন তোমাকে দেখেছিলাম তখন তোমার চেহারা চোখে পড়েছিল, কিন্তু এখন আমি তোমাকেই দেখি, তোমার চেহারাতো আর দেখতে পাইনে।" - ১৪

এই উপন্যাসে যথার্থ গানকে ভালোবাসতে গিয়ে গায়িকার আদর্শ ও মানবিকতার বিভিন্ন দিক বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

২) প্রথম পুরুষের জবানীতে রচিত উপন্যাস ঃ

এই পর্বে রচিত উপন্যাসগুলি হলো "যেদিন ফুটলো কমল", "পরিক্রমা" ও "পরস্পর" এই উপন্যাসগুলির শিল্পরীতি নীচে আলোচনা করা হলো। এই উপন্যাসগুলিতে প্রথম পুরুষের জবানীতে লেখক যেন গল্প বলেছেন। এই রীতিতে লেখা তিনটি উপন্যাসে বুদ্ধদেব পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নগর জীবনকে। নায়ক ও নায়িকাকে গোটা উপন্যাসে বুদ্ধদেব যেন নিয়ন্ত্রিত করেন নি, চরিত্রগুলি স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করেছে।। পাশ্ব চরিত্রের কোন ভূমিকা এখানে দেখা যায় না। লেখক নায়ক ও নায়িকার প্রেমের আলোকে তাদের ভাবজগতে প্রবেশ করাতে উৎসাহী ছিলেন। এই ধরনের উপন্যাসগুলিতে নারী চরিত্রের ভূমিকা বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

"পরিক্রমা" (১৯৩৬ খ্রীঃ) উপন্যাসটি প্রথম পুরুষের জবানীতে লেখা উপন্যাস। বুদ্ধদেব দাম্পত্য পরিবারের ঘটনাকে এই উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। তিনি এই উপন্যাসের ঘটনাগুলিকে আটটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। অরুণা ও প্রশান্ত, সুমিতা ও বিজন, কঙ্কন ও মল্লিকা - এই তিনটি পুরুষ ও নারী চরিত্রের প্রেম উপন্যাসের প্লটে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধদেবের এই উপন্যাসের নরনারীদের তেমন কোন ব্যক্তিত্ব দেখান নি। উপন্যাসে দুটি উপকাহিনী রয়েছে। চরিত্রগুলির কথাবার্তায় কোন প্রখর চাতুর্য লক্ষ করা যায় না, তবে সংলাপে নূতনত্ব দেখা যায়। উপমাকে জড়িয়ে লেখক সংলাপগুলি রচনা করেছেন -

"শুধু যদি পৃথিবীতে এত মানুষ না থাকতো! ভাবলে বরুণা। একটি অদ্ভুত নীতি আমাদের যে আমরা সাপ মারতে পারি, মশা মারতে পারি, স্বার্থের যুদ্ধ বাধিয়ে বহু মানুষও মারতে পারি। শুধু যে লোকটাকে দেখলেই আমার সমস্ত শরীর রী-রি করে ওঠে, যে আমার জীবনে অনেক লাঞ্ছনা ঘটিয়েছে, বিদ্বেষের সংক্রোমণে, যে আমাকে অনেক সময় তার মতোই নীচ করে তোলে - তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে আমি বলতে পারব নাঃ যাও তুমি, তুমার মুখ দেখতে চাইনে!" - ১৭

সোমনাথ চরিত্রের কোন পরিপূর্ণতা উপন্যাসে দেখা যায়না। বরুণা নিজেকে শেষের দিকে সঙ্কীর্ণমনা রূপে ধরা দিয়েছিল। বিজন ঘোষ চরিত্রটি নারী বিদ্বেষী রূপেই লেখক অঙ্কন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে
"বাস্তবিক! মেয়ে জাতটাই শয়তানের প্রতিমূর্তি" - ১৮
এ সংলাপে "পরিক্রমা" উপন্যাসে বুদ্ধদেবের একটি নূতন রীতি ধরা পড়েছে।

"পরস্পর" (১৯৩৪ খ্রীঃ) উপন্যাসের নায়ক ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। বুদ্ধদেব এই চরিত্রে কল্পনাকে বেশী মাত্রায় স্থান দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসের নায়ক অশান্ত। উপন্যাসের পটভূমিতে এসেছে তার দাম্পত্য জীবনের ছবি। বুদ্ধদেব অশান্ত চরিত্রে বাস্তবের সঙ্গে যেন কোন মিল রাখেন নি। অশান্ত যেন সবসময় কল্পনার জগতে ভেসে বেড়ায়। উপন্যাসের শেষের দিকে নায়কের মিলন দৃশ্য থাকলেও তা কাব্যিকতার মোড়কে ঢাকা পড়ে গেছে-
"তাকিয়ে একটু দ্যাখো, কি সুন্দর দিন।
অশান্ত রাণীর মুখের দিক তাকিয়ে রইলো।

এই দিন এখনই কেন এসে ঢুকলো ? এই দিনতো তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। না, না, ওকথা বোলো না। তাকে আসতে দাও, তাকাও তার দিকে। খুসি হয়ে তার দিকে তাকাও - আমাদের নতুন জীবনের এই প্রথম দিন।" - ১৯
দাম্পত্য জীবনের কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে দেখা যায় না।

ক) নাট্যরীতি সংমিশ্রণ ঃ

এই পর্বের "বিশাখা" (১৯৪৫ খ্রীঃ), "দুই ঢেউ এক নদী" (১৯৩৬ খ্রীঃ) উপন্যাস দুটির শিল্পশৈলী নীচে আলোচনা করা হলো।

বুদ্ধদেব বসুর "বিশাখা" উপন্যাসটি দ্বিতীয় পর্বে লেখা। লেখক উপন্যাসের কাহিনীতে একটা প্রেমের ঘটনাকে রেখে কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। তিনি ঘটনার বিস্তৃতি না দেখিয়ে একটা বিষয়কে পল্লবিত করেছেন। আমাদের সামাজিক জীবনে এই উপন্যাসের ঘটনা বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসের বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিক থাকলেও লেখক এই ভাবনা কে এখানে দেখাননি। প্রেমের নূতন তাৎপর্য এখানে এনেছেন -
"ছেলেমেয়েরা নিজেরা যখন বিয়ে করে তাকে আমরা বলি প্রেমে পড়া বিয়ে। এই প্রেমে পড়া ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনেক মা-বাবার মনে একটা নিদারুণ ত্রাস আছে - এখনো আছে। কেন, কে জানে। তাঁরাও তো প্রেমে পরেছেন, যদিও বিয়ের আগে নয়, পরে। বিয়ের আগে প্রেমে পড়ার সুযোগই তাঁরা পেতেন না, এত অল্প বয়সে তাঁদের বিয়ে হতো। অবশ্য বিয়ের পরে, বেশ কিছুদিন পরে, অন্য কোন পুরুষ বা নারীর প্রতি তাঁরা যে মনে মনে কখনোই মধুর হননি, তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে ?" - ২০

যদিও উপন্যাসের নায়ক স্মরজিৎ ও নায়িকা বিশাখার দাম্পত্য জীবন দিয়ে লেখক উপন্যাসের প্লতি অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসের প্রথমেই লেখক নায়িকার পিতা হৃদয়রঞ্জনের প্রেম সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণার কথা আমরা উপন্যাসে পেয়ে থাকি। তা নিয়ে সে গর্ববোধও করতো। উপন্যাসের প্রথমেই লেখক উল্লেখ করেছেন - "গুপ্ত সাহেব (সকলে তাঁকে তা-ই বলে জানে) জীবনে কখনও প্রেমে পরেন নি। না

বাল্যে, না কৈশোরে, না যৌবনে, না পৌঢ়ত্বে। না কোন মেয়ের সঙ্গে, না কোন পুরুষের সঙ্গে, না কোন বই বা ছবি বা সুর বা ভাবের সঙ্গে।" - ২১

এর পরেই শুরু হয় উপন্যাসের নাটকীয় মোড়। বুদ্ধদেব এখানে অঙ্কন করেন স্মরজিতের বিদেশ যাওয়ার ঘটনা। লেখক দাম্পত্য জীবনে স্মরজিতের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি এনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরান। লেখক স্মরজিতের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে তার স্থানে গানের শিক্ষক অসীম মুখোপাধ্যায়কে আনেন। হঠাৎ অসীমবাবুকে এনে লেখক উপন্যাসে নাটকীয় চমক এনেছেন। এখান থেকেই উপন্যাসের মূল প্রণয়ঘটিত সমস্যা দেখা যায় বিশাখাকে নিয়ে। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে বিশাখা যে বিবাহিত নারী এই ধারণা তার মধ্যে কোথাও দেখান নি। সে প্রেমের উচ্ছল যৌবনাবেগে অসীমকে কাছে এনেছিল। স্মরজিতকে বিশাখা ভুলে গিয়েছিল। বিবাহের পরেও মেয়েদের যে উত্তাল প্রেমাকর্ষণ থাকে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন। তিনি উপন্যাসের শেষে স্মরজিতকে বিশাখা ও অসীমের যৌনালিঙ্গনের প্রত্যক্ষদর্শী রূপে প্রতিষ্ঠিত করে উপন্যাসে জটিলতা এনেছেন।

এই সময় দুজনের সংলাপে নাটকীয় তীব্র গতি ও মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ করা যায়। এই সংলাপে স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব অনেক বেশি সত্য বলে মনে হয়। এক সময় স্মরজিৎ যখন ফিরে আসে তখন সে বলে -

"কেমন ছিলে শখা ?
কেমন আবার থাকবো ?
তোমার বুঝি খুব ভয় হয়েছিল আমার জন্য ?
মা-বাবা খুব ব্যাকুল হয়েছিল - আমার মোটেও ভয় হয় নি।
কি করলে এই এক বছর ?
কি আর করলাম ! খেলাম, ঘুমোলাম, মোটা হলাম।" - ২২

আবার বিশাখার সঙ্গে অসীমের একান্তভাবে নির্জন ঘরে তাদের প্রেমালাপ স্মরজিত নিজে লক্ষ করে। এখানেই উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এখান থেকেই শুরু হয়। স্মরজিৎ তার শ্বশুর মশাইকে জানিয়ে দেয় - "আপনাদের কন্যার সঙ্গে আমার আর কোন সংস্রব নেই। ছেলেবেলা থেকে যে সম্পর্কের

বাল্যে, না কৈশোরে, না যৌবন্নে, না পৌঢ়ত্বে। না কোন মেয়ের সঙ্গে, না কোন পুরুষের সঙ্গে, না কোন বই বা ছবি বা সুর বা ভাবের সঙ্গে।" - ২১

এর পরেই শুরু হয় উপন্যাসের নাটকীয় মোড়। বুদ্ধদেব এখানে অঙ্কন করেন স্মরজিতের বিদেশ যাওয়ার ঘটনা। লেখক দাম্পত্য জীবনে স্মরজিতের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি এনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরান। লেখক স্মরজিতের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে তার স্থানে গানের শিক্ষক অসীম মুখোপাধ্যায়কে আনেন। হঠাৎ অসীমবাবুকে এনে লেখক উপন্যাসে নাটকীয় চমক এনেছেন। এখান থেকেই উপন্যাসের মূল প্রণয়ঘটিত সমস্যা দেখা যায় বিশাখাকে নিয়ে। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে বিশাখা যে বিবাহিত নারী এই ধারণা তার মধ্যে কোথাও দেখান নি। সে প্রেমের উচ্ছল যৌবনাবেগে অসীমকে কাছে এনেছিল। স্মরজিতকে বিশাখা ভুলে গিয়েছিল। বিবাহের পরেও মেয়েদের যে উত্তাল প্রেমাকর্ষণ থাকে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন। তিনি উপন্যাসের শেষে স্মরজিতকে বিশাখা ও অসীমের যৌনালিঙ্গনের প্রত্যক্ষদর্শী রূপে প্রতিষ্ঠিত করে উপন্যাসে জটিলতা এনেছেন।

এই সময় দুজনের সংলাপে নাটকীয় তীব্র গতি ও মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ করা যায়। এই সংলাপে স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব অনেক বেশি সত্য বলে মনে হয়। এক সময় স্মরজিৎ যখন ফিরে আসে তখন সে বলে -

"কেমন ছিলে শখা ?
কেমন আবার থাকবো ?
তোমার বুঝি খুব ভয় হয়েছিল আমার জন্য ?
মা-বাবা খুব ব্যাকুল হয়েছিল - আমার মোটেও ভয় হয় নি।
কি করলে এই এক বছর ?
কি আর করলাম ! খেলাম, ঘুমোলাম, মোটা হলাম।" - ২২

আবার বিশাখার সঙ্গে অসীমের একান্তভাবে নির্জন ঘরে তাদের প্রেমালাপ স্মরজিত নিজে লক্ষ করে। এখানেই উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এখান থেকেই শুরু হয়। স্মরজিৎ তার শ্বশুর মশাইকে জানিয়ে দেয় - "আপনাদের কন্যার সঙ্গে আমার আর কোন সংস্রব নেই। ছেলেবেলা থেকে যে সম্পর্কের

দাবীতে আপনাদের সঙ্গে আমার বন্ধন, আজ থেকে তা ছিন্ন মনে করবেন। আমার আর খোজ খবর নেবেন না আপনারা - আমি চললাম।" - ২৩
এর পরও স্মরজিৎ এর বিশাখাকে নেওয়ার আরকটি পত্র উপন্যাসের শেষে দেখতে পাই।

উপন্যাসের প্লটে প্রেমের বিভিন্ন সমস্যা যে জটিল আকার ধারণ করেছিল সে দিকটা তুলে ধরা প্রয়োজন। এখানেও নাটকীয় ভঙ্গিতে চরিত্রগুলির ভাবান্তর ঘটেছে। স্মরজিত নিজের ভূল বুঝতে পারে। স্মরজিত হয়তো ভেবেছিল এতদিনে বিশাখা অসীমকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে পথ চেয়ে বসে আছে। স্মরজিত এক পত্রে বিশাখাকে তার কর্মস্থলে নিয়ে যাবার কথা জানিয়েছে। বিশাখা সেই পত্র পড়ে অসীমকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

একটি ছকের সাহায্যে বিশাখাকে উপন্যাসে লেখক কিভাবে দেখিয়েছেন তা দেখানো হলো।

প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব	তৃতীয় পর্ব
চৌদ্দ বছর বয়সে বিশাখা ও স্মরজিতের বিবাহ।	এক মাসের দাম্পত্য জীবন।	স্মরজিতের বিদেশে পড়াশুনা।
স্মরজিতের অনুপস্থিতিতে আর্টের শিক্ষকের সঙ্গে বিশাখার আলাপ।	অসীম হৃদয়রঞ্জনের পরিবারের সঙ্গে মিশে যায়।	বিশাখা ও অসীমের প্রেমালাপ
বিশাখা ও অসীমের চূড়ান্ত প্রেমালিঙ্গনের মুহূর্তে স্মরজিত প্রত্যক্ষদর্শী।	স্মরজিতের কর্মস্থলে বিশাখাকে নিয়ে যাবার চিঠি।	বিশাখা ও অসীমের পালিয়ে যাওয়া।

"দুই ঢেউ এক নদী" (১৯৩৬ খ্রীঃ) উপন্যাসে নাট্যরীতি অবলম্বনে বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে সংলাপ রচনা করেছেন। অরুণা ও অশোক পিতা মাতার বাধা অতিক্রম করে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রচলিত ছক থেকে একটু ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নায়ক নায়িকাকে তীব্র ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ঘাত প্রতিঘাত ও তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে লেখককে সবসময় সংলাপে যুক্তি ও তর্কের বাক্যবাণ তৈরী

করতে হয়েছিল। লেখক নাটকের সংলাপে গোটা উপন্যাসে একটা উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম পুরুষের জবানীতে বুদ্ধদেব বসু গোটা পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা বলেছেন। উপন্যাসে ভাষা প্রয়োগের নৈপুণ্য লক্ষ করা যায়। স্বাধীনচেতা ও উদার চরিত্র বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে এঁকেছেন। কিন্তু স্বাধীন মতামত প্রতিষ্ঠায় চরিত্রগুলির পারদর্শিতা দেখা যায় না। এই উপন্যাসে দুই ভাই ও বোনকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসু পারিবারিক সংকটের একটা মুহূর্ত তৈরী করেছিলেন -

"রাগ বুঝি ? এগুলো ভালো হয়নি তা তো বলিনি, বলছিলুম যে -
থাক, থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমার খাতা দিন।
দিচ্ছি। এক-এক করে ছবি কটি ছিঁড়ে নিয়ে খাতাটা ফিরিয়ে দিলেন।
আমার ছবি আপনি রাখলেন যে ?
আবার এত অভদ্রতা" - ২৪

এই ধরনের সংলাপ উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে লেখক দেখিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মেয়ের কাছে পরিবারের সকলকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

খ) পত্র বিনিময় ও ডায়েরী রীতি ঃ

এই রীতির অন্তর্গত উপন্যাসগুলি হলো "অকর্মণ্য" (১৯২৯-৩১ খ্রীঃ), "এক বৃদ্ধের ডায়েরী" (১৯৭২ খ্রীঃ)। প্রথমেই "অকর্মণ্য" উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

"অকর্মণ্য" (১৯২৯-৩১ খ্রীঃ) উপন্যাসটির প্লটে কয়েকটি স্বতন্ত্র কাহিনী ধারা মিশ্রিত হয়েছে।ডায়েরী বা চিঠি লেখার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন। এই উপন্যাসে ডায়েরী লেখার রীতি কাজ করেছে। বুদ্ধদেব বসু এই ডায়েরী রীতি অবলম্বন করে উপন্যাসগুলিতে একটি নূতনত্বের সৃষ্টি করেছিলেন। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু ডায়েরী লেখায় ব্যস্ত। তিনি উপন্যাসের মধ্যাংশ থেকে এই ডায়েরীলেখা শুরু করেছিলেন। এই রীতিতে রচিত উপন্যাসগুলি অবশ্য সার্থক হয় নি। অনেকাংশে ডায়েরী লিখতে গিয়ে উপন্যাস ভারাক্রান্ত হয়েছে। অভিনব তথ্য ডায়েরীর মধ্যে দেখিয়ে উপন্যাস জগতে তিনি নূতনত্ব আনতে চেয়েছিলেন। যদিও শিল্প মূল্যের দিক দিয়ে লেখকের এই সব উপন্যাসগুলি ব্যর্থ হয়েছিল।

"অকমর্ণ্য" উপন্যাসে বুদ্ধদেব প্রেমের এক স্বাচ্ছন্দ্য রূপ তুলে ধরেছেন। পারিবারিক জীবনের জটিলতায় বুদ্ধদেব শিল্পরীতিতে এক নূতন ঘটনাকে সংযোজন করার চেষ্টা করেছেন। লেখক এই উপন্যাসে খেলার ছলে ডায়েরী লিখতে গিয়ে উপন্যাসের মূল ফর্ম যেন ধরে রাখতে পারেন নি। এই উপন্যাসে বিষয়গুলি হল ঃ

১) পারিবারিক সম্পর্ক।

২) উপন্যাসে সাতটি ক্রমিক সংখ্যার পর জ্যোতির্ময়, সরোজ, অনুসূয়া, শশাঙ্ক, রিণি শিরোনাম লেখার পরে আটটি ক্রমিক সংখ্যায় ডায়েরী লেখার ঘটনা।

বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসের প্লটে জ্যোতির্ময়বাবুর পরিবার অঙ্কন করেন। জ্যোতির্ময়বাবুর দুই কন্যা অনুসূয়া, রিণি ও বাড়ির পরিচয় দিয়ে লেখক উপন্যাসটি শুরু করেন। রচনা রীতির দিক থেকে নূতন রীতি বুদ্ধদেব আবিষ্কার করলেন। উপন্যাসের ফ্রেমটি এইরকম - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, জ্যোতির্ময়বাবু, অনুসূয়া, শশাঙ্ক, রিণি, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, তারপর ৫ই চৈত্র থেকে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত রিণির ডায়েরী লেখা।

উপন্যাসের মধ্যাংশে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনীর মাধ্যমে জটিলতা শুরু হয়। কিন্তু চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও জীবন দর্শনের সাবলীলতা "অকর্মণ্য" উপন্যাসে দেখা যায় না। রিণির দীর্ঘ ডায়েরী লেখায় তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসের শশাঙ্ক চরিত্রে নির্বোধ, ব্যক্তিত্বহীন পুরুষের উপাদানগুলি সংযোজন করেছেন। লেখকের ভাষাতে -

"শশাঙ্ক একটা ইডিয়টের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল" - ২৫

রিণি চরিত্রে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ থাকলেও অনুসূয়ার অসুখে ঔপন্যাসিকের মতামত অধরা থেকে যায়। শশাঙ্ক রিণিকে চায় প্রেমের উচ্ছলতায়, মনের গভীরতায় নয়। তাই শশাঙ্ক, রিণি ও অনুসূয়াকে কেন্দ্র করে একটি জটিলতা উপন্যাসে দেখা যায়। এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু প্রেম বিরহকে হালকাভাবে চরিত্রগুলির মনোলোকে আনতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে সংলাপ রচনায় নাটকীয় ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। এছাড়া বর্ণনার চেয়ে স্বগতোকথনে পাত্র-পাত্রীকে আগ্রহী করেছে। লেখক খেলার ছলে সংলাপগুলি মাঝে-মধ্যে অপরিণত হলেও চরিত্র বিকাশে সার্থক হয়েছে।

"আমার মন তীরের গতির মত সোজা, তীক্ষ্ণ ও নিশ্চিত। কোন অকারণ সন্দেহ বা স্বকল্পিত সমস্যা আমাকে পীড়া দেয় না। আমার মনকে আমি নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী হতে শিখিয়েছি। সে যা চায়, তা পাঞ্জল ভাষায় জোর করে বলে, এবং তার সে আকাঙ্খা পূরণ করতে আমি সাধ্যমতো চেষ্ঠা করি।" - ২৬

শশাঙ্ক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক যেন নিজের আত্মকথন রীতিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। "শশাঙ্ক বাবু কেন আমাকে কোন সাহায্য করছেন না ?" -২৭
খন্ড সাহিত্য ও কবিমনের বিকাশ উন্মুখ সংলাপগুলি কতকটা কৌতুকের লঘু সুরে বাঁধা। কৌতুকের ঘনঘটা এই উপন্যাসে সংলাপে আমরা দেখতে পাই-

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখছিলাম, চোখ মেলে যখন দেখি, সে বিছানার পাশে বসে আছে। শশাঙ্কবাবু বলতো সে কে ?" - ২৮

অভিজাত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর বর্ণাঢ্য আয়োজনকে কেন্দ্র করে সংলাপগুলির মধ্যে আলাদা কোন গুরুত্ব বোঝা যায় না।

এই ধরনের আরেকটি উপন্যাস হল "এক বৃদ্ধের ডায়েরী"। বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাসের মধ্যে কোন সমন্বয় ও সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায় না। অনেক সমালোচক মনে করেন বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে সাজিয়ে একটি রূপ দেওয়ার ব্যর্থ পরিকল্পনা মাত্র। লেখক "এক বৃদ্ধের ডায়েরী" উপন্যাসে বীরেন্দ্র সিংহের পারিবারকে এনেছেন। তাদের একমাত্র মেয়ে মায়ালতা। মায়ালতাকে উপন্যাসের গৃহ শিক্ষক রণেনের সঙ্গে বিয়ের একটি পারিবারিক সম্মতি উপন্যাসে দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে বুদ্ধদেব বসু মায়ালতার বিদেশে পড়াশুনার ঘটনাটি এনেছেন। এই ঘটনায় নায়ক রণেন ও নায়িকা মায়ালতার বিচ্ছেদ এসেছিল। বিশেষ করে মায়ালতা রণেনকে ভুলে গিয়েছিল। তৃতীয় থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নায়ক রণেনকে হতাশার মধ্যে দিন কাটাতে দেখা যায়। উপন্যাসের শেষে তাদের কোন মিলনদৃশ্য দেখা যায় না। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে নায়ক নায়িকাকে শুধু ডায়েরী লিখিয়ে তাদের মনের বেদনা প্রকাশ করিয়েছেন। যার ফলে উপন্যাসের ঘটনায় কোন গতি ছিল না। আবার মায়ালতার মধ্যেও নারীসুলভ আচরণের অভাব লক্ষ করা যায়।

গ) আত্ম কথন রীতি

বুদ্ধদেব বসু কল্লোল পর্বের একজন খ্যাতনামা লেখক। এছাড়া কল্লোল পর্বের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রত্যেকের মনেই বরীন্দ্রযুগের বিরুদ্ধাচরণ ছিল তাঁদের সাহিত্য রচনায়। এই বিরুদ্ধাচরণের অর্থ অবশ্য নেতিবাচক নয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বজায় রেখে বুদ্ধদেব উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে নূতনত্ব আনতে চাইলেন। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে এই নূতনত্ব আনতে গিয়ে আত্মমুখীনতাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। লেখক ভাবুকী মেজাজে গল্প বলার ঢং-এ একটি নূতন রীতি উপন্যাসে তুলে ধরলেন। বুদ্ধদেব "সাড়া" উপন্যাসে বাল্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় রূপে ও রসে নুতনত্ব এনেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু বাইরের ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত নয়, প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনের উর্দ্ধে মানুষের যে সাধারণ জীবন থাকে তাকেই লেখক উপন্যাসে তুলে ধরলেন। লেখক যেন কল্পনা ও ভাবনার নকশায় চরিত্রগুলিকে স্বভাবের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কাহিনীতে রূপ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সমকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনেরই কথা বলেছেন। বুদ্ধদেব সেকালের তরুণ লেখক ও কিশোরী নারীসমাজের চিন্তা চেতনার ও উপভোগের বাসনায় যেন এই কথাগুলি বলেছেন। এই উপন্যাসে পারিবারিক জীবনে বাধাহীন জীবনযাত্রায় প্রত্যেক নারী-পুরুষ পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধদেবের এই আত্মকথনমূলক উপন্যাস হলো "সাড়া" (১৯২৮ খ্রীঃ), "সানন্দা" (১৯৩৩ খ্রীঃ), "রডোডেনড্রনগুচ্ছ" (১৯৩১ খ্রীঃ), "শেষ পাণ্ডুলিপি" (১৯৫৬ খ্রীঃ), "ধূসর গোধূলি" (১৯৩২ খ্রীঃ), "বাড়ি বদল" (১৯৩৪ খ্রীঃ), "লালমেঘ" (১৯৩৪ খ্রীঃ) ইত্যাদি।

"সাড়া" (১৯২৮-৩০ খ্রীঃ) উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর এই আত্মকথনরীতি উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে অবক্ষয়িত সময়ের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবক্ষয় ও মাত্রাধিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত ভাঙ্গনের পটভূমিকায় চরিত্রগুলিকে অঙ্কন করেছেন। আঘাত ও বেদনাময় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যিক ও রোমান্টিক কল্পনার শিল্প শৈলীতে প্রেমের স্থূল ও প্রেমজনিত বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ফুটে ওঠা একটা বিশেষ ভাবনা উপন্যাসে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। "সাড়া" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু নায়ক সাগরের বাল্য জীবন থেকে শুরু করে যৌবনের দেহকামনার জীবন পর্যন্ত কাহিনী উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের বিষয়কে বুদ্ধদেব পাঁচটি শিরোনামে ভাগ করেছেন। তিনি "সাড়া" উপন্যাসে উপমা হিসাবে

স্বপ্নের দৃশ্য তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের প্রথমে নায়কের মা মলিনা এবং উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে নায়ক সাগরের স্বপ্নের দৃশ্য রয়েছে। এই দুটি দৃশ্যে বুদ্ধদেব যৌন চেতনার মধ্যে ফ্রয়েডীয় চিন্তা চেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমে সাগরের মা -

"পাহাড়ের খাড়া গায়ের উপর বুক রাখিয়া দুটি হাতের উপর শরীরের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া একটু একটু করিয়া সে কাৎরাইতে-কাৎরাইতে উপরে উঠিতে লাগিল। ঠান্ডায় তাহার পেট কাটিয়া যাইতেছে, কঠিন বরফের উপর হাতের নখ বসে না - কোন রকমে একটু ফসকাইতে পারিলেই হাড়-গোড় সুদ্ধ চুরমার হইয়া যাইবে। নিজের বুক দিয়া পাহাড়ের বুক ঘষিতে-ঘষিতে সে অত্যেন্ত সর্ন্তপণে নিজেকে ঊর্ধ্বাভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।" - ২৯

তৃতীয় খণ্ডে সাগরের স্বপ্ন দর্শন-

"একটা অস্ফুট রুদ্ধ আর্তনাদ করিয়া সে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল, ঘামে সমস্ত শরীর ভিজিয়া গেছে, একটি হাত ঘুমন্ত মণিমালার স্তনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ঘুমাইলে মণিমালার নাকের ভিতর দিয়া অদ্ভুত এক প্রকার মৃদু শব্দ হয়। দুঃস্বপ্ন পীড়িত সাগরকে আজ কেহ বুকে জড়াইয়া ধরিল না, ছাতে ঠান্ডা হাওয়ায় লইয়া গিয়া অপর্যপ্ত চুম্বনে মুখ ভরিয়া দিল না। গান গাইয়া ঘুম পাড়াইল না।" - ৩০

বর্ণনা ও সংলাপের মধ্যে সচেতনতা লক্ষ করা যায়। সংলাপে সাধু ভাষার ব্যবহার দেখি। জটিল বাক্য রচনায় বুদ্ধদেবের আগ্রহ দেখা যায়।

"তথাপি মণিমালাকে নির্বাক দেখিয়া সাগর আবার বলিল, আমি তাকে এক রকম কথাই দিয়েছি যে কাল রওনা হইতে হইবে" - ৩১

বর্ণনাভঙ্গি ছিল সংক্ষিপ্ত ও বস্তুকেন্দ্রিক। অকারণে কবিত্ব উপন্যাসের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। দেহ প্রেমের উচ্ছ্বাসকে বুদ্ধদেব সংযত করতে পারেন নি। উপন্যাসের প্রথমে বাৎসল্য রসের দৃশ্যের ক্ষেত্রে মানব স্বভাবের স্থূল যৌন চেতনা উপন্যাসে দেখা যায়।

"-মলিনা বাহিরে যাওয়া মাত্র সাগর লক্ষ্মীর মুখটা জোর করিয়া বালিশের উপর ফেলিয়া তাহার কানে দ্রুত স্বরে বলিতে লাগিল" - ৩২

আরেকটি দৃশ্যে দেখা যায়

"আপাদমস্তক শিহরিত হইয়া সাগর এক হাতে লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে চেয়ারের হাতলটাকে শক্ত মুঠিতে আঁকড়াইয়া ধরিল" - ৩৩
আবার থিয়েটার দেখার পর বাড়িতে এসে দেখা যায় সাগর ও লক্ষ্মীর বৃষ্টি ভেজা দিনের পরিচয় লেখক দিয়েছেন এভাবে -

"একটা চাদর টানিয়া দুইজনকেই তাহার মধ্যে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ভিজা পায়রার মতো কাঁপিতে লাগিল সে। লক্ষ্মী তাহাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ নিয়া নিঃশ্বাসপাতের মতো নিঃশব্দে বলিল, সাগর রে!" - ৩৪

লেখক এই উপন্যাসে চিঠির সাহায্যে সচেতন মনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তীর্যক ভঙ্গিতে মনের চেতন ও অচেতন দিকগুলি তুলে ধরেছেন। এই মনোভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে সাগরকে ভাবুকী মনের এবং সত্যবানকে শরৎচন্দ্রের দেবদাসের আদলে বুদ্ধদেব বসু আঁকতে গিয়ে যেন ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়। ঘটনার উত্তেজনায় কিম্বা আবেগ তাড়িত সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায় না। সাগরকে বাল্যসঙ্গী লক্ষ্মীর সঙ্গে অন্ধকার ঘরে যে যৌনালিঙ্গনের দৃশ্য দেখা যায়, তাতে সাগর চরিত্রের স্বতন্ত্রতা বলতে পারি।

আত্মকথন ভঙ্গী উপন্যাসের বিভিন্ন খণ্ডে নায়ক সাগরকে কতটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে তার একটি ছক নীচে দেওয়া হলো।

	ঘুমপাড়ানির গান খণ্ড	কাকস্নান খণ্ড	সোনার শিকল খণ্ড	অবগাহন খণ্ড	সাড়া খণ্ড
সাগর ও লক্ষ্মী	সাগর ও লক্ষ্মীর বাল্যকাল	কোলকাতায় সাগরের কলেজ জীবনে পত্রলেখা ও সত্যবান	সাগরের সঙ্গে মণিমালার স্বল্পদিনের বিবাহিত জীবন	সাগরের আবার কোলকাতা গমন	সাগরের বাল্যকালের সাথী লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা ও তাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

উপন্যাসে সাগরের এই পরিবর্তনে যেসব বিষয় উপাদান ও চরিত্রগুলি কাজ করেছিল সেগুলি হল - স্বপ্ন, দর্শন, কবিতা লেখার আগ্রহ ও সাহিত্যিক রূপে কলেজ জীবন, চিঠি বিনিময়, সত্যবানের সঙ্গে হোস্টেল জীবন, পরিবেশগত প্রভাব, পত্রলেখা ও নির্মলা। এছাড়া উপন্যাসে দীর্ঘ বাক্যের রচনাভঙ্গী আলাদা বৈচিত্র্য এনেছিল- "সাগরের রক্তের মধ্যে তখন তুমুল তোলপাড় চলিতেছে, পত্রলেখার মুখের প্রত্যেকটি কথা সহস্রগুণ হইয়া তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া দিয়া গুঞ্জিত হইতেছে, কন্দর্পের কথা প্রায় শুনিতেই পাইলেন না।" - ৩৫

এই "সাড়া" উপন্যাসে শৈশব স্মৃতি অনেকটা আছে। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন- "সাড়া" উপন্যাসের প্রথম অংশে "আমার বন্ধু" উপন্যাসে পুরানো পল্টন, নোয়াখালি, "চার্লস চ্যাপলিন" ও "রামায়ণ" প্রবন্ধে কোন কোন ছোট গল্প ও কবিতায়, এছাড়া কয়েকটি উপন্যাসমূলক ক্ষুদ্র রচনাতেও শৈশব স্মৃতির ইতিবৃত্ত টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। এছাড়া "সাড়া" উপন্যাসে "শর" ও "থিয়েটার" দেখার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেবের শৈশব স্মৃতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।
"ভাদ্রের প্রখর রৌদ্রে ভাদ্রের প্রবল জোয়ার কেমন ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া উঠিবে, সকালে চায়ের টেবিলে সাগর মা-বাবার মুখে এই আলোচনা শুনিল" - ৩৬
এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেবের নোয়াখালির ভাঙ্গনের স্মৃতি ভেসে উঠতে দেখা যায়।

"সাড়া" উপন্যাসে ঘটনার গতি থামিয়ে বুদ্ধদেব বসু যৌন ও যৌবনের চূড়ান্ত মুহূর্তটি তৃতীয় খণ্ডে দেখিয়েছেন। এই খণ্ডে নির্মলা নামে পতিতা পল্লীর মেয়েকে দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে সাগরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়। কলেজ স্ট্রীট, ধর্মতলার আলোকিত পথের বর্ণনায় তিনি প্রত্যক্ষ দৃশ্যকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। এই উপন্যাসে চরিত্রগুলি ভাবুকী, কেউ বা বড় সাহিত্যিক।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে ঘটনার বিবরণকে মিশিয়ে পাত্র-পাত্রীদের হৃদয় যন্ত্রণাকে সামনে এনেছেন। তিনি যৌবন সৌন্দর্য্যে মোহিত। লক্ষ্মীর শরীরের মধ্যে যৌন আবেগ ছিল, সে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক স্বামীকে নিয়ে সে সুখী হতে পারে নি।

"একদা তুমি প্রিয়ে" (১৯৩৩ খ্রীঃ) উপন্যাসে বুদ্ধদেব পলাশ ও রেবার মধ্যে পূর্ব স্মৃতি প্রেমের এক জটিল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। রেবা ও পলাশের মনে একটা অশুভ,

অস্পষ্ট আবেগ ও মোহ তাদের মধ্যে সহানুভূতি লাভের একটা ব্যাকুল আকাঙ্খা দিয়ে উপন্যাসের শেষ প্রান্তে লেখক প্রবেশ করেন। কখনও ভিন্নমুখী জীবন যন্ত্রণার সংঘাত লেখক দেখিয়েছেন-

"কি অন্যায় রেবাদি যদি আপনাকে দেন ? প্রতিমা সমস্যার একটি সমাধান খুঁজে পেলো। পাগল না কি! এ আমি কিছুতেই দেবো না পলাশ কে!" - ৩৭

এই জীবন সংগ্রামকে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত জীবন সংগ্রাম বলা যায়। কোথাও চকিত অবচেতনের দ্বারা উদঘাটিত হয়েছে আবার কোথাও সুপ্ত ভাবনার সক্রিয়তা অনুভব করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রতিটি খণ্ডে পলাশ প্রতিমার প্রেমের নূতন দিক দেখা যায়। অন্যদিকে রেবার পূর্বস্মৃতি প্রেমের জড়তা কাটিয়ে ওঠার মধ্য দিয়েও বুদ্ধদেবের জীবনকে স্পর্শ করেছিল বলে মনে হয়। এই উপন্যাসে শেষপর্যন্ত রেবার সেই প্রেমের স্মৃতি কখনও পলাশ ভুলতে পারে নি। তাই তার হৃদয়ে সে প্রেয়সীর ভূমিকায় রয়ে গেল। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে পলাশকে মূল কাহিনীতে রাখলেও সব সময় রেবার মনে সচেতনতা আনেন নি।

চরিত্রগঠনে বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে কয়েকটি বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেব রেবা ও পলাশকে ব্যক্তিত্ব দিয়ে উপন্যাসে গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের প্রয়োজনে বুদ্ধদেব অত্যন্ত সংযমভাবে প্রীতি ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

এছাড়া বিশেষ তাৎপর্য ও বর্ণনার পরিবেশ উপন্যাসে যেন গীতিকাব্যের সুর শোনা যায়। উপন্যাসের সংলাপে কাব্যিকতা, ভাবমুক্ত, স্বচ্ছন্দ সংলাপে মধুরতা লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে চরিত্রের যে বিশেষত্ব, সংলাপের কারুকার্যে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্ঠা করলেও প্রেমের সম্মোহন ইন্দ্রজালে সংলাপ যেন ঢাকা পড়ে গেছে। এই উপন্যাসের সংলাপগুলি কবিত্বের মোড়কে ঢাকা।

"পলাশ কিছু ভাবেনি, কোন সংকল্পও করেনি - তবু সে দাঁড়িয়ে রইলো, অপেক্ষা করতে লাগলো, যেন কোন সম্মোহনে স্তব্ধ। আর রাত্রির স্রোত তার উপর ঝরে পড়লো অজস্রভাবে, তারার আলোয় ক্ষীণ পাংশুতার মূর্তি।" - ৩৮

লেখক কবিত্বময় সংলাপে মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা ও নায়ক নায়িকার মানসিকতার আত্মপ্রকাশ দেখিয়েছেন।

বুদ্ধদেব "শেষ পাণ্ডুলিপি" (১৯৫৬ খ্রীঃ) উপন্যাসের প্লটে একটি দাম্পত্য পরিবারকে স্থান দিয়েছেন। এই পরিবারের জীবনের সমস্যা ও চরিত্রগুলি সমতালে আবর্তিত হয়। ঘটনা থেকে অনেক চরিত্রের অধঃপতন ও যৌন আকর্ষণ উপন্যাসে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এখানেও বুদ্ধদেব নায়ক প্রফুল্লের মধ্যে সাহিত্য লেখার একটা অভ্যাস উপন্যাসের প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন -

"লেখাটা যতক্ষণ আমাকে মাতাল করে রাখতে পারে ততক্ষণই লিখতে পারি আমি।"

-৩৯

তিনি এই উপন্যাসের শেষের দিকে দুটি পরিবারকে এনেছেন। লেখক উপন্যাসের ঘটনাকে দুইটি অংশে ভাগ করেছেন।

প্রথম অংশে প্রফুল্লের পরিবার, দ্বিতীয় অংশে বন্ধু পত্নী অর্চনার সংসার।

লেখকের উদ্দেশ্য প্রফুল্লকে সৎ পথে ফেরাতে বন্ধুর প্রয়াস। কিন্তু পশু মনোভাবের যে কোন অবস্থায় পরিবর্তন হয় না - এই ধারণা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক বীরেশ্বর নিজের জীবন ও বন্ধুপত্নী অর্চনার জীবনকেও ধ্বংস করেছিল। বীরেশ্বরের হিংসাশ্রয়ী মনোভাব এই উপন্যাসে তিনটি কারণে এসেছিল বলে লেখক জানিয়েছেন। ক) উত্তরাধিকার সূত্র থেকে তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার। খ) অবিবাহিত জীবনে অস্থিরতা। গ) যৌন কামনার আকর্ষণ। ঘ) বীরেশ্বর পিশাচ শ্রেণীর চরিত্র। কোন ধর্মাধর্ম, বিবেকবোধ, লেখক এই চরিত্রে দেখান নি। লেখক উপন্যাসে গাড়ি দুর্ঘটনা, বন্ধুপত্নীর মৃত্যু, হাসপাতলে বীরেশ্বরের বিকৃত মস্তিষ্ক, এই সব ঘটনা এনে উপন্যাসে একটা মাত্রা আনার চেষ্টা করেছিলেন।

"পাথরের মতো স্থির হয়ে গেছে অর্চনার চোখ, মৃতের দৃষ্টির মতোই স্থির ও চিরন্তন - সেই চোখ, যা আমি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনা।

আমাকে দেখে প্রফুল্ল বিকট আওয়াজে বলে উঠলো, 'বীরেশ্বর, তুমি এই করলে!' আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার আগেই আমার সারা আকাশ অন্ধকার হয়ে গেলো। পরে শুনেছি একটি মিলিটারি লরি আমাদের দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়েছিল।" -৪০

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর ভাষা কোথাও চঞ্চল, দ্রুতগতি আবার কোথাও মন্থর হতে দেখি। ধীর লয়ে ঘটনা এনেছেন লেখক। ছোট বড় নানা আকারের বাক্যের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায় -

"প্রফুল্ল আপনাকে ভালোবাসে।"

আবার "তার পর আমি দেখলাম মস্ত কালো গাড়ি এসে সামনে দাড়িয়ে সম্মোহিতের মতো আমিও উঠে তার পাশে বসলাম" -৪১

অন্যান্য উপন্যাসের মতো সংলাপে ব্যঞ্জনধর্মিতা নেই। উপমা চিত্রকল্পগুলি বুদ্ধদেব নিজের জবানীতে রচনা করেছেন। তবে তিনি উপন্যাসে কিছুটা নাটকীয় সংলাপ এনেছেন। আবার লেখক কখনও উপন্যাসে পারিবারিক কোন্দলের তীব্র জটিল কাহিনী তুলে ধরেছেন।

"সানন্দা" (১৯৩৩ খ্রীঃ) উপন্যাস থেকে বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের নূতনত্বের আরেকটা মাত্রা সংযোজিত হল। বুদ্ধদেব বসু আলোচ্য উপন্যাসে জীবনের যে রূপ এঁকেছেন, তা কেবল সাধারণ মত দিয়ে ভাবা বলে মনে হয় না। উচ্ছ্বাস, হতাশা, চার্তুয্যের দ্বারা সংপৃক্ত একটা সমগ্রতা পাত্র-পাত্রীর মনোভাবে ফুটে উঠেছে।

লেখক "সানন্দা" উপন্যাসের প্লটে একটি খামখেয়ালিপনার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। সানন্দার পরিকল্পনায় চরিত্রের নিঃসঙ্গতা ও যে প্রকৃতি ধরা পড়ছে, তাতে বাস্তব জীবনের ছবি লক্ষ করা যায়। লেখক এই উপন্যাসে কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু শিল্পগত দুর্বলতা কাহিনীতে লক্ষ করা যায়। ঘটনাগত বৈচিত্র্য যদিও তেমন অসামঞ্জস্য হয়নি। শুধু সানন্দা চরিত্রের কিছু নূতনত্ব দেখা যায়।

উপন্যাসের চরিত্র কল্পনায় বুদ্ধদেব কাব্যিক চেতনার কল্পিত ছবি এঁকেছেন। যা নিঃসন্দেহে ছড়িয়ে গিয়েছিল মালতীর জীবনে। সাহিত্য রচনায় নায়ক-নায়িকাদের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। "সানন্দা" উপন্যাসের সংলাপ সমাজ ও সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সংলাপগুলি দুর্বল বলে মনে হয়। চরিত্রের সংলাপে কোন গতি দেখা যায় না। তবে প্রেমের যে বৈচিত্র্যের সুর স্বরতন্ত্রীর তারে বেজে ওঠে, তা বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন- যেমন "এক রুদ্ধ আবেগে তারা গুলো থর থর করে কাঁপছে। তোমার তাই মনে হয় না। সানন্দা মুখ ফেরাতেই আমার গালের সঙ্গে ওর মাথার ঘষা লেগে গেল।" এই সংলাপের মধ্যে মানব হৃদয়ের শূন্যতার মাঝেও যেন গভীর প্রেমের উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করা যায়।

"লালমেঘ" (১৯৩৪ খ্রীঃ) উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর পারিবারিক উপন্যাস। মানব অন্তরের যে গাঢ় যন্ত্রণাময় দিক থাকে, তাকে বুদ্ধদেব সহজ সরল চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। লেখক উপন্যাসের প্রথমে অভিজাত পরিবারের ঘটনাকে কাহিনীতে এনেছেন। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসের প্লটে চারটি ঘটনার মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনকে স্থাপন করেছেন। ক) অবিনাশ ও শোভনা রায়ের পারিবারিক জীবন। শোভনা রায় অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। খ) অবিনাশ ও শোভনা রায়ের সংসারে তৃতীয় চরিত্র সন্ধ্যামণির প্রবেশ। গ) অবিনাশ ও সন্ধ্যামণির সংসার।

দীর্ঘদিনের অসুখে শোভনা রায় অবিনাশের কাছে থেকেও দূরে ছিল। শোভনা ও অবিনাশের শূন্যতার মাঝে সন্ধামণীর অবস্থানকে লেখক স্থান দিয়েছে। মনোস্তাত্ত্বিক ভঙ্গি নিয়ে সন্ধ্যামণিকে বার বার পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। শোভনা রায়ের অসুস্থতা এই উপন্যাসের গল্পের বাঁক ফেরার জন্য মূলত দায়ী। এই উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের অবৈধ রীতি কাজ করেছে। পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সন্ধ্যামণি মিশে গিয়ে তার চরিত্রের বিবর্তন ঘটিয়েছে। এই বিবর্তনে অবিনাশ বাবুর যৌন তাগিদে সন্ধ্যামণি তার কাছে এসেছিল। যার ফলে অবিনাশ ও সন্ধ্যামণির দেহ মিলন তাদের সংসার জীবনকে বাঁধতে সাহায্য করেছিল।

"সমস্ত পৃথিবি যাতে মুগ্ধ, এক জনের পক্ষে তা যথেষ্ট হয়। সে তৃপ্ত হবে শুধু তাকে নিয়ে, তার সত্তার নগ্ন আর পবিত্র শুভ্রতা নিয়ে। সমস্ত সামাজিক পরিচয়ের আচ্ছাদন থেকে মুক্ত সেই নিগূঢ় মিলন। আমি তোমার জন্য উৎসুক, আমার সমস্ত রক্ত তোমার দিকে ঠেলে উঠছে। তুমি এসো আমার কাছে রাত্রির অন্ধকারে, রাত্রিকে আলোড়িত করে, রাত্রিতে ঝড় তুলে দিয়ে। ঝড় উঠুক সমুদ্রে, রক্তের বিশাল, অন্ধকার সমুদ্রেঃ অন্য সব, অন্য সবকিছু লুপ্ত হয়ে যাক সেই রক্তের উত্তপ্ত অন্ধকারে।
- কাল, কালই ওকে যেতে হবে, আরো একবার পাশ ফিরে অবিনাশ ভাবলে।" - ৪২

শোভনা রায় চরিত্রের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু নীরবতার ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। যেমন উপন্যাসের শেষে শোভনা রায় মারা গেল, না বেঁচে রইল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। একটা আকস্মিক ট্রাজেডির সুর শোভনা চরিত্রে লেখক তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব বসু শোভনা ও সন্ধ্যামণির মনের গভীরে লুকোনো সত্যকে মনোস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে

নিয়ে গিয়েছেন। দাম্পত্য প্রেম যে যৌন চাহিদার কাছে সংযম ধরে রাখতে পারে না তা লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের শেষের দিকে সন্ধ্যামণি কাজের মেয়ে আর নয়, সে এখন অবিনাশের স্ত্রী। শোভনা রায় এখন ভাড়াটে নার্সের সেবা শুশ্রূষায় বেঁচে আছে। এই উপন্যাসের সংলাপ বুননে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতময় একমুখীনতা রয়েছে। বুদ্ধদেব পারিবারিক জীবনের ঘটনাকে এই উপন্যাসে আলাদা মাত্রা দিয়েছেন। এই উপন্যাসে তেমন বড় উপকাহিনী নেই। বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য উপন্যাসের মত কবি মনের আলো এই উপন্যাসে তেমন প্রভাব পড়তে দেখা যায় না। পারিবারিক জীবনে নায়ক স্বগতোমুখী। এই মনোভাব বুদ্ধদেবের নিজেরই মনোভাব। আর এই মনোভাবকে বুদ্ধদেব অবিনাশের জীবনে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের শোভনা চরিত্রটিকে ব্যক্তিত্বময়ী নারী রূপে বুদ্ধদেব এঁকেছেন। অবিনাশ উপন্যাসের প্রথমে শোভনাকে ভালোবাসে, কিন্তু শোভনার দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি ও সন্ধ্যামণির আপ্যায়ন দাম্পত্য জীবন থেকে শোভনাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

৩) বর্ণনামূলক ও বিবৃতি প্রধান রীতি

ক) তৃতীয় পুরুষের জবানীতে

"আয়নার মধ্যে একা" (১৯৬৮ খ্রীঃ) উপন্যাসে লেখক তিনটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কাহিনী তুলে ধরেছেন। কমলা, শ্যামলী ও অবনী এই তিনটি চরিত্রে লেখক একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখিয়েছেন। কমলাকে একটি অত্যাচারী পরিবারের মধ্যে প্রথমে দেখা যায়। কমলার পিসির গোপন ষড়যন্ত্রে সে গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল। ক্রমে শ্যামলীকে কমলার কাছে স্থাপন করে লেখক উপন্যাসে জটিলতা এনেছেন। এই কাহিনীর মাঝে কমলাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল অবনী। লেখক উপন্যাসের শেষে কমলা ও অবনীর মিলন দৃশ্য এনেছেন। এই উপন্যাসে কমলা চরিত্রে নূতন আদর্শের রূপরেখা বুদ্ধদেব বসু অঙ্কন করেছেন। মানুষের জীবন সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসের শেষে জানিয়েছেন - "সত্যিকার জীবন, সত্যিকার বিয়ে। গাঁটছড়া বেঁধে বাসরঘরে তারাঃ সে আর অবনী।"৫৪৯পৃ/১০টি উপন্যাস। সংলাপগুলি সংক্ষিপ্ত নয়, কোন কিছু বর্ণনা করতেগিয়ে

বাক্য গুলি ইঙ্গিতময়তা হারিয়েছে। "মেঘলা দিন, টিপ টিপ বৃষ্টি, ম্যুজিয়মের বাস থেকে নামলো, হাঁটছে, বাড়ির গায়ে নম্বর দেখে দেখে।" - ৪৩

চরিত্রগুলির মধ্যে কমলা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক লেখক উপন্যাসে দেখিয়েছেন। শ্যামলী চরিত্রটি উপন্যাসে তেমনভাবে ফুটে ওঠে নি।

খ) লেখকের জবানীতে

"মৌলিনাথ" (১৯৫২ খ্রীঃ), উপন্যাসের ঘটনাকে লেখক তিনটি খণ্ড ও একটি উপসংহারের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই তিনটি খণ্ডকে যেন আলাদা গল্প বলা যেতে পারে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র মৌলিনাথ সাহিত্যিক ও উদার মনের মানুষ। লেখক মৌলির জীবনের আদর্শকেই উপন্যাসে মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে দেখিয়েছেন। উদাসীন ভাবুক প্রকৃতির মানুষের জীবনে একদিকে সাহিত্য চর্চা ও অন্যদিকে জীবনের সমস্যা কিভাবে রূপায়িত হয় তা এই উপন্যাসে দেখা যায়। মৌলির জীবনে জটিল দ্বন্দ্ব আনতে লেখক গীতা ও চিত্রা নামে দুটি নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই দুজনের প্রেমের মাঝে অনেক সময় মৌলিকে অসহায় বলে মনে হয়।

"হয়েছে তোমার ? শেষ করেছ ? মৌলি চমকে উঠলো আওয়াজ শুনে - ঐ রকম ন্যাকড়া ছেঁড়ার মতো চাপা অথচ কর্কশ আওয়াজ গীতার গলা থেকে বেরোতে পারে সে ভাবেনি কখনো - আর এ কী আগুন রং কখনো তার মুখে জ্বলে উঠলো! গীতা! - তার দিকে হাত বাড়ালো মৌলি - কি হয়েছে তোমার ? কিন্তু গীতা মাথা নেড়ে উড়িয়ে দিলো ঐ উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, তার সামনে শূন্যটাকেই ঠেলে দিল হাত দিয়ে। শেষ করেছ তুমি?" -৪৪

লেখক সাহিত্যকে অবলম্বন করে গীতাকে ভালোবাসার যেন কাহিনী রচনা করেছেন। মৌলিনাথকে লেখক সবসময় একটা আদর্শের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। মৌলিনাথ চরিত্রই বুদ্ধদেব বসুর জীবনের আদর্শ। সে গীতাকে ভালোবাসলেও তার বহিঃপ্রকাশ উপন্যাসে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

"জীবনের তত্ত্ব বোঝালে, মেয়েদের বিষয়ে মন্তব্য শোনালে; আমার বিষয়ে ভবিষ্যৎবানী করলে দু একটা। পন্ডিত্ব তুমি - চিন্তাশীল সুধীজন - কথা বলার অধিকার আছে তোমার।" -৪৫

যৌবনের উচ্ছ্বাস এই উপন্যাসে প্রবলভাবে দেখা যায় না, তবে গীতা চরিত্রের মধ্যে এই মানসিকতা লেখক এনেছিলেন। মৌলিনাথ চরিত্রকে বুদ্ধদেব বসু বাস্তব সংসার জীবন থেকে দূরে একটা কল্পনার জগতে রেখে দিয়েছিলেন। যার ফলে চরিত্রটির মধ্যে রোমান্স খুব বেশিমাত্রায় কাজ করেছিল।

"আমার বন্ধু" (১৯৩৩ খ্রীঃ) উপন্যাসে লেখকের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের ইচ্ছাকে বুদ্ধদেব বসু কৌতূহলী মানসিকতায় তুলে ধরেছিলেন। এক জন লেখক তার সৃষ্ট সাহিত্য প্রকাশে কতটা আনন্দ পায় সেই ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র ভবভূতি একটি উপন্যাস লিখে বন্ধুকে দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এই হরভজন চরিত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তিসত্তা বা লেখক হবার কোন যোগ্যতাই বুদ্ধদেব বসু দেখান নি।

"ভবভূতির বিচার বোধ ছিলনা, মাত্রা জ্ঞান ছিলনা। ভবভূতির উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে অনেকে ক্লান্তি বোধ করতো।" -৪৬

এই উপন্যাসের সংলাপ বিবরণ ধর্মী। সংলাপে কোন গতিময়তা নেই। যেমন -

"ভবভূতি উঠে এসে আমার পাশে বসলো। যখন দাড়ালো লক্ষ করলাম, লম্বায় ও অদ্ভুতরকম, অসংগত রকম বেড়েছে।" - ৪৭

উপন্যাসের প্লটে কোন জটিলতা নেই। ভবভূতি পরিবারের কথা থাকলেও তারা সে ভাবে উপন্যাসে প্রাধান্য পায় নি।

গ) <u>প্রথম পুরুষের সরাসরি উক্তি</u>

"ধূসর গোধূলী" (১৯৩২ খ্রীঃ) উপন্যাসে বুদ্ধদেবের বন্ধু স্বয়ং গল্প কথক নীলকণ্ঠ। অপর্ণা ও কল্যাণকুমারের প্রেমের বৈচিত্র্য তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছেন। কল্পনা জগৎ ও কর্ম জগতের প্রভেদ তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছেন। অপর্ণা চরিত্র

উপন্যাসে বৈচিত্র্য এনেছে। কল্যাণকুমার অপর্ণাকে দিদি বললেও তার প্রতি আলাদা প্রেম উপন্যাসের শেষের দিকে বুদ্ধদেব বসু তুলে ধরেছিলেন -

"তোমার কষ্ট ? অপর্ণার কথা ভাবো কখনো মনে মনে ? ও মেয়েটাকে নিয়ে খুবতো সুখ হলো আমার - এলে তুমি বুঝি এলে মায়ের জীবন নষ্ট করতে" -৪৮

আবার উপন্যাসের শেষ অংশে লেখক এই সংলাপ দিয়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন -

"আমার নির্জনতা আজ তোমাকে দিলাম - নাও, হাত বাড়িয়ে নাও, একবার বলো যে ভুলে যাওনি" -৪৯

তার প্রেম উপন্যাসে এক আলাদা মাত্রা এনেছে। দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক ও পরিণাম এই উপন্যাসের কল্পনা জগতে স্বপ্নজাল রচনা করেছে।

উপন্যাসের সংলাপে কাব্যিকতার ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। প্রেমের কোন বিশেষত্ব উপন্যাসে দেখানো হয় নি। অপর্ণা ও কল্যাণকুমারের ভালোবাসা উপন্যাসে অপূর্ণ থেকে গেছে। উপন্যাসের কোন চরিত্রের সক্রিয় সাড়া দেখা যায় না। অপার্থিব মোহের মধ্যে চরিত্রগুলিকে নিবদ্ধ থাকতে দেখা যায়।

৪) চেতনা প্রবাহ রীতি

এই পর্বের উপন্যাসগুলি হল -"কালোহাওয়া" (১৯৩৯-৪০ খ্রীঃ) ও "তিথিডোর" (১৯৪৭-৪৯ খ্রীঃ)। এই উপন্যাস দুটি নীচে আলোচনা করা হল-

"কালো হাওয়া" উপন্যাসে বুদ্ধদেব বাস্তব বিষয় থেকে পরিবারের চেতনার প্রসার ঘটিয়েছেন। উপন্যাসটি চেতনা প্রবাহ রীতিতে লেখা আমরা বলতে পারি। পরিবারের পতন কিভাবে গৃহকর্তার চোখের সামনে ঘটেছিল তার পরিচয় এই উপন্যাসে পাই। অরিন্দম শান্ত ও খোশ মেজাজী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তার এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তায় সংসারে সংকট উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন। হৈমন্তীর অন্ধ গুরু ভক্তি সংসারে পতন ডেকে এনেছিল। হৈমন্তী গুরু সেবায় নিজের স্বামী, মেয়ে সবই পরিত্যাগ করেছেন। উদভ্রান্ত চিত্তের ছায়াবাজি কিভাবে সংসার জীবনে পতন ডেকে এনেছিল তার পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়।

"মহামায়া ব্যথিতস্বরে বললেন, সত্যি কি হৈমন্তী পাগল হয়ে গেলো ?
তাছাড়া আর কি বলবে ?
তাঁর ধারণা বাবাকে ষড়যন্ত্র করে আমি মেরেছি - বাড়িতে যে যায় তাকেই বলে ও কথা।"
- ৫০

পরিবারের কর্তা স্নেহ ও ভালোবাসাকে প্রশ্রয় দিয়ে তিলে তিলে সংসার জীবনকে ধ্বংস করেছে। এক নিবিড় শূন্যতা ও ভয়াবহ বিপর্যয়ের ঈঙ্গিত বহন করে সমস্ত বাড়িতে পাখা বিস্তার করেছে মহামায়া নামে এক ভণ্ড সাধু। জীবনের শূন্যতা নিয়ে হৈমন্তী সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এর ফলে হৈমন্তীর গুরু অন্ধতা সংসারকে শেষ করে দিয়েছিল। বুদ্ধদেব উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে বাস্তববোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অঙ্কন করেছিলেন। হৈমন্তীর চিত্তবিকার ও পিস্তলের গুলিতে অরিন্দমের মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। অরুণ হত্যাকারী হিসাবে মহামায়ার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। তার জীবনকে ধ্বংসের মূলে মহামায়া উপন্যাসের শেষে লেখক তা দেখিয়েছেন। তাই অরুণ ব্যকুল সুরে বলেছে -
"মহামায়া হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে বললেন, এসব পাগলামি তোর মাথায় কে ঢোকালো বলতো ? অরুণ ব্যকুল সুরে বললে, কেন আমাকে দূরে ঠেলে রেখে আমাকে কষ্ট দাও ? অরুণের গলা প্রায় ধরে এলো।" - ৫১

"কালো হাওয়া" উপন্যাসে শিল্পরীতির নূতন মুখ খুলে দেবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। রচনা ভঙ্গী একেবারে নূতন। একটি পরিবারে দুইটি চরিত্র মা-ছেলে, মহামায়া দেবীর ভক্ত। বুদ্ধদেব বসু গল্পের এই রীতিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে একের পর এক ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। উপন্যাসের প্লটে রয়েছে মহামায়া নামে একটি ভণ্ড চরিত্র। হৈমন্তী ও অরুণের সংসার ভণ্ড মহামায়ার নির্দেশে যেন পরিচালিত হচ্ছে। বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে অন্ধ বিশ্বাস কিভাবে সংসারের পতন ডেকে আনে তার পরিণাম তুলে ধরেছেন।

"কালো হাওয়া" উপন্যাসের আরম্ভটি ধীর, সোজাসুজি ঘটনার মধ্যে পড়ে নি। উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘটনা নিয়ন্ত্রিত। নাট্য রসের উপস্থিতি এই উপন্যাসে রয়েছে। তবে ঔপন্যাসিক চরিত্রের স্বাধীনতা বর্জন করেন নি। "কালো হাওয়া" উপন্যাসটি বারোটি পর্বে বুদ্ধদেব বসু ঘটনা সাজিয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছদে অরিন্দম

বোসের পরিবারকে দেখানো হয়েছে। সংযমহীন উদার মনের মানুষ ছিল অরিন্দম। দুই মেয়ে বুলি ও মিনিকে নিয়ে অরিন্দমের পরিবার। পরিবারের সকলের প্রতি ছিল অরিন্দমের দয়া ও সহানুভূতি। অরিন্দমের স্ত্রী হৈমন্তী মহামায়া দেবীর প্রতি বিশ্বস্ত। এই বিশ্বাস থেকেই সংসার জীবনের পতন বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

তৃতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঘটনা নেই। মহামায়ার আদেশেই অরুণের বিয়ে হয়। অরুণের স্ত্রী উজ্জ্বলা। তাদের ছেলের দীর্ঘ রোগভোগের ঘটনা উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দেখা যায়। অরুণ চুরি করে বাড়ি থেকে উধাও হয়। এর কিছু দিনের মধ্যে অরুণের ছেলে মারা যায়। উজ্জ্বলা কোলকাতায় বাপের বাড়িতে চলে আসার ঘটনা দিয়ে লেখক নবম পরিচ্ছেদের ইতি টেনেছেন। দশম পরিচ্ছেদে অরুণের বন্ধু নিরঞ্জনের প্রবেশ। বুলির সঙ্গে প্রেম, পরিণতিতে বাড়ি থেকে তারা দুজন পালিয়ে গিয়ে এলাহাবাদে বিয়ের ঘটনা লেখক এনেছেন।

এই উপন্যাসে ঘটনা নাটকীয়। বুদ্ধদেবের অন্য উপন্যাস থেকে এই উপন্যাসটির ঘটনা আলাদা। লেখক উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্রে অরিন্দমের পরিবারকে সামনে রেখে বিভিন্ন চরিত্রের বিবরণ দিয়েছেন। হৈমন্তীর জীবনে কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। যখন সে চেতনা পায় তখন তার স্বামী মারা গিয়েছে। ভন্ড সাধুর প্রতি তার মোহ ভঙ্গ হয়। হৈমন্তীর পুত্র অরুণও নিজের ভুল বুঝতে পারে।

চরিত্র বিশেষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও একান্ত বিশ্বাসের কাহিনীকে উপন্যাসের প্রথমে লেখক প্রাধান্য দিলেও তার বিপর্যয় যে কিভাবে সংসার জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে এই নাট্যরস উপন্যাসে সর্বত্র রয়েছে। লেখক এই ঘটনাকে উপন্যাসে সহজ ও সরল ভাবে সাজিয়েছেন। চরিত্রগুলি বিশেষতঃ অরুণ উচ্ছৃঙ্খল, সংযমহীন খেয়ালী মনের চরিত্র। হৈমন্তীর অন্ধবিশ্বাসে তার দাম্পত্য জীবনের পতন ডেকে আনে।

খ) চলিত বাক্‌রীতি

"বাসর ঘর" (১৯৩৩ খ্রীঃ) উপন্যাসটির শিল্পরীতিতে চলিত বাক ও মনস্তত্ত্ব মূলক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। আদর্শ শিল্পরীতির সন্ধান বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। কাহিনী, সংলাপ, চরিত্র ও লেখকের জীবন দর্শন এই উপন্যাসে সাবলীল

ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উপমা দিয়ে চরিত্রের মনোলোকে লেখক প্রবেশ করতে চেয়েছেন-

"তার গম্ভীর ধ্বনি পরাশরের বুকের মধ্যে স্পন্দিত। আকাশের অন্ধকার যেন কোন দুর মন্দিরের ঘন্টার শব্দে ভরে গেলো" - ৫২

উপন্যাসের কাহিনীতে আবার কুন্তলা ও পলাশের প্রেমের বিবরণ পাই। তাদের প্রেম যেন ক্ষণিকের বৃষ্টিধারা। পলাশ ও প্রতিমার নূতন প্রেমের সূচনা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়। তাদের প্রেমের মধ্যে কোন গভীরতা লেখক দেখান নি।

বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে চরিত্র বিশেষে আত্মকথনের ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। কাহিনী বিন্যাসে, ঘটনা নির্মাণে, চরিত্রাঙ্কন রীতিতে ও ভাষায় - এক কথায় উপন্যাস শিল্পের সবকটি আঙ্গিকে কবিত্বময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।

"যে মেয়ে তার এত দিনের রচনা, এ কি সেই মেয়ে ? দুজনের মধ্যে জন্মনিল বিশাল রহস্যময় নদী, স্বপ্নের মতো কানে এসে লাগছে আতঙ্কের কালো জলের কলরোল। এ নদী কোথায় গেছে কত ঘুর্ণিতে কত আবর্তে, কত প্রচন্ড ডেউ তুলে, অন্ধকার বিসর্পিল স্রোতে কোন পরিপূর্ণতার সময় হীন দীগন্ত হীন সমুদ্রে।" - ৫৩

প্রেমের আবেগ উপন্যাসে চরিত্রের মধ্যে সবসময় লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের শেষে বুদ্ধদেব একটি প্রেমের ঝংকার তুলে যেন তৃপ্তি পেয়েছেন। এই রীতি তাঁর অনুসৃত ও চিরাচরিত লিখনভঙ্গীর বিরুদ্ধে অনন্ত প্রেমের জয়গান রচনা করেছে।

৫) বহুকথন রীতি ও স্বদেশ ভাবনা

"মন-দেয়া-নেয়া" (১৯৩২ খ্রীঃ) উপন্যাসটি নয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। উপন্যাসে তিনটি পুরুষ চরিত্র- দ্বিজেন, ঈশান, সিতাংশু এবং তিনটি নারী চরিত্র- সুলতা, মীরা ও মালিনীর পরিচয় পাই। তিনটি করে নারী ও পুরুষ চরিত্রে সাহিত্যচর্চা ও লেখার ঝোঁক কম বেশি লক্ষ্য করা যায়। এখানে প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে দিয়েই একাধিক কথন ভঙ্গি বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন। বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্য ও প্রেম নিয়ে। কোন চরিত্রের

মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা আলাদাভাবে ফুটে ওঠেনি। উপন্যাসের পটভূমিকায় চৌরঙ্গী ও ধর্মতলাকে কেন্দ্র করে নায়ক-নায়িকাদের বিচরণ লক্ষ করি। উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইন্দ্রজিতের পরিচয় পাই। বুদ্ধদেব বসু ইন্দ্রজিতের সূত্র ধরেই দুটি চরিত্র সুলতা ও ঈশানকে এনেছেন। ইন্দ্রজিৎ একনিষ্ঠ সাহিত্য প্রেমী, উদার, সৎ মনের অধিকারী কিন্তু অন্য দুটি বন্ধুর মধ্যে দ্বিজেন একেবারেই পিশাচ, ভণ্ড শ্রেণীর চরিত্র। উপন্যাসে যৌন তাড়নার উদ্দাম বহিঃপ্রকাশ মূলতঃ দ্বিজেন চরিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই। দ্বিজেনের থেকে ইন্দ্রজিৎকে বেশী আত্মসচেতন করার প্রবণতা লেখক দেখিয়েছেন। একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে বুদ্ধদেব উপন্যাসে দ্বিজেন ও সিতাংশুকে দেখিয়েছেন। দ্বিজেন চরিত্রটিকে বুদ্ধদেব অসামাজিক রূপে উপন্যাসে এঁকেছেন। কারণ সে ইন্দ্রজিতের হাত ধরে সুলতার বাড়িতে গিয়েছিল। সুলতার সঙ্গে দ্বিজেনের যৌন মিলন উপন্যাসে আলাদা মাত্রা এনেছে।

এই উপন্যাসে একটি উপকাহিনী আছে, তা হলো সিতাংশু - মালিনীর প্রেমের কাহিনী। কিন্তু কবি তাদের প্রেমের বিস্তার ও স্বতন্ত্রতাকে দেখান নি। প্রত্যেকটি চরিত্রের কবিতা লেখার অভ্যাস এই উপন্যাসে দেখা গেলেও কাব্যধর্মিতার আড়ালে বুদ্ধদেব উপন্যাসের চরিত্রে প্রেমের প্রয়োগ কৌশল শিল্প হিসাবে কবিতা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"আপনার চেয়ে
যে - প্রেম মহানতরো
জোনাকীর মত
জ্বলে সে ধরণী-'পর
যতই গোপন করো
জোনাকীর মত ? দ্বিজেন বললে, জাপানিদের প্রেম কি জোনাকির মত ঠাণ্ডা ?" - ৫৪

ইন্দ্রজিতের সঙ্গে মীরার পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে উপন্যাসের প্রথম অংশে জানতে পারি। কিন্তু দ্বিজেন, সিতাংশু তাদের বিবাহ বন্ধনে বাধা সৃষ্টি করেছে, বুদ্ধদেব ইন্দ্রজিতের বন্ধুদের বখাটে চরিত্র হিসাবেই উপন্যাসে এঁকেছেন।

মীরার বিয়েতে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গটি রূপকের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে।

"দুজনের পায়ের ধাক্কায় নৌকা গেল জলের মধ্যে অনেকখানি সরে- বাকি দুজন পড়ে রইল"।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে সংলাপ রচনায় বিদেশী লেখকদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরাজী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গ এনে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা এই উপন্যাসে এনেছেন। সিতাংশুও বলেছে -

"ইজাডোরা ডানকনে একবার বার্নাড শ কে লেখা পাঠালাম ঃ তোমার Intellect আর আমার Beauty দিয়ে যদি একটা মানুষ তৈরী হয়, তাহলে তার জন্য পৃথিবী আমাদেরকে ধন্যবাদ দেবে"। বার্নাড শ জবাব দেন ঃ "কিন্তু যদি সে ব্যক্তি আমার Intellect আর তোমার Beauty নিয়ে আসে ?"

পাশ্চাত্য কবিদের ও নাট্যকারদের নিয়ে ইন্দ্রজিৎ ও সিতাংশুর মধ্যে এই ভাবে বার বার তর্ক-বিতর্ক করতে দেখা গেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রকে লেখক যেন নিজেই কারো সঙ্গে গল্প করে বলেছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপে অবচেতন মনের অন্তঃমুখী জগতের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি এঁকেছেন। জীবন চেতনার কোন গভীরতা কোন চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্রগুলো অনেক জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

"গোলাপ কেন কালো" (১৯৬৭-৬৮ খ্রীঃ) উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দেশে যে স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপট উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধদেব মূলত এই পটভূমিকায় দেশ ও মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। পরিবারের কাহিনীগুলিতে হৃদয়ের কামনা-বাসনার স্রোত বৃহত্তর জাতীয় জীবনে একটি তাৎপর্য এনেছিল।

"ভারতবর্ষ কি টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে আবার ? তার পর আবার কেউ বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসবে ? আর সেই ইংরেজ, যাদের আমরা ঘটা পটা করে দেশ থেকে তাড়ালুম, তারা সমুদ্রের ওপারে বসে কেমন হাসছে বলুন তো ? তাদের বিরুদ্ধে যে সব অস্ত্র আমরা চালিয়ে ছিলুম সেগুলি দিয়ে পরস্পরকে আমরা জখম করছি এখন -

পরস্পরকে, মানে নিজেদেরই। তামাসা - তাই না ? জানেন, আমিও একবার ভেবেছিলুম ইংরেজকে তাড়াতে পারলে ভারতবর্ষ ভূস্বর্গ হবে" - ৫৫

বুদ্ধদেব আঙ্গিকের নূতন সম্ভাবনা এই উপন্যাসে দেখান নি। উপন্যাসের প্লটে পাঁচটি কাহিনীর পৃথক চেহারা ধরা পড়েছে। যদিও সবটা মিলে বেশ জট পাকিয়ে গিয়েছে।

বুদ্ধদেব এই উপন্যাসে রণজিৎ এর জবানীতে কথা বলেছেন। বহুকথন রীতি এখানে অনুসৃত হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে সাহিত্য লেখক রণজিৎ এর পরিবারের সুন্দর ছবি দেখা যায়। উপন্যাসের অষ্টম খণ্ডে কাজলের সঙ্গে রণজিৎ এর অবৈধ সম্পর্ক। কাজলের স্বামী ফটিক উচ্চশিক্ষা লাভে বিদেশ গিয়ে স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হন। এই সময় কাজল ও রনজিৎ-এর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফটিক ছিলেন রণজিৎ এর মামা। দীর্ঘদিন কাজল ও ফটিকের মধ্যে অবৈধ প্রণয় লেখক দেখিয়েছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রই নিজের কথনে ঘটনাকে অগ্রসর করেছে। লেখক উপন্যাসের ঘটনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ফটিক ও কাজলের ভূমিকা জীবন্ত বলে মনে হয়েছে।

অনাদি এই উপন্যাসে স্বদেশী ভাবনার মূর্ত প্রতীক। বুলবুল ও অমূল্য সকলেরই অনাদিবাবু ছিলেন স্বদেশী ভাবনার মূল প্রেরণা দাতা। অনাদিবাবুর মেয়ে মিতার সঙ্গে রণজিৎ এর প্রেম, অন্যদিকে রণজিৎকে একইভাবে ভালোবাসে বুলবুল। এই ত্রিভুজ প্রেমের প্রসঙ্গ বুদ্ধদেব উপন্যাসের শেষে এনেছেন। কারণ মিতার বাড়িতে পিস্তল চুরি করে বুলবুল। বুলবুলের এই চুরিতে মিতার চার বছর জেল হয়। এই ঘটনা দিয়ে লেখক উপন্যাসে জটিল পরিস্থিতি তৈরী করেছেন।

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু বিচিত্র ভঙ্গিতে স্বদেশ ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছেন। লেখক যখন আর্থার জোন্সের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করেন তখন বুলবুলের মধ্যে দেখা গিয়েছে তীব্র স্বদেশ ভাবনা। ঔপন্যাসিক এখানে নিজস্ব স্বদেশ ভাবনা ও ঘটনার বিবরণে বুলবুল চরিত্রকে তীব্র স্বদেশী চেতনার মূর্ত প্রতীক করে গড়ে তুলেছিল।

বুদ্ধদেব তার প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতে কাজল ও রণজিৎ এর অবৈধ প্রণয় আকর্ষণ দেখিয়েছেন। অনুশোচনা, পাপবোধ এবং নিজেকে ফাঁকি না দেওয়ার আত্ম-অনুশোচনায় বুলবুল ও মিতাকে রেখে কাজলকেই জীবন সঙ্গিনী করেছে। স্বামী-স্ত্রীর

দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরানো বুদ্ধদেবের উপন্যাসে একটি চেনা সুর। এই দাম্পত্য জীবনে অবৈধ প্রেমের স্বীকৃতি দেবারও চেষ্টা বুদ্ধদেব অন্যান্য উপন্যাসের মত এখানেও দেখিয়েছেন। অসংযতভাবে ঘটনাকে সোজাসুজি উপন্যাসে এনেছেন। উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল তারই প্রতিফলন বুলবুল, অমূল্য, রণজিৎ চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই। এখানে লেখকের স্বদেশ ভাবনা কেবলমাত্র বুলবুল চরিত্রের মধ্যেই জীবন্ত করে তুলেছিলেন। আর অন্য চরিত্রগুলির মধ্যে ততটা সজীবতা লক্ষ করা যায় না। গোটা উপন্যাসে মৃত, অস্থির, গতিহীন ভঙ্গি নিয়ে চরিত্রগুলি বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে এঁকেছেন। চরিত্রগুলির আত্মমর্যাদা আছে। বুদ্ধদেব বসু প্রণয়ের ব্যাপারে আধুনিক নাট্যধর্মী সংলাপ ব্যবহার করেছেন।

"গোলাপ কেন কালো" উপন্যাসের সংলাপ গুলি ধীর স্থির, মার্জিত ও বিনয়ী। প্রেমাকর্ষণ থাকলেও তা তীব্র হৃদয়বিদারী নয়। লেখক স্বদেশী ভাবনার মেঘলা আবহাওয়ায় গোটা উপন্যাসে একটা গোপন পরিবেশ তৈরী করেছিল। লেখক ইংরেজদের প্রতি রণজিৎ এর সংলাপ, ছড়াকাটা প্রভৃতির কৌতুক রসের স্বাদে আকর্ষণ আনার চেষ্টা করেছেন।

"বুলবুলের সঙ্গে মিতুর বন্ধুতার ভিত্তিটা কী তা জানার জন্য কৌতূহল হলো আমার, জিজ্ঞাস করলাম, বুলবুলকে আপনিকি অনেক দিন ধরে চেনেন ?" -৫৬
সংলাপের মধ্যে একটা অজানা কারণে প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখে প্রশ্ন করতে দেখা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর স্বদেশ ভাবনা - "গোলাপ কেন কালো" উপন্যাসে দেখা যায়। উপন্যাসের প্রচলিত প্রথা থেকে বুদ্ধদেব বসু বেরিয়ে এসে স্বদেশীয়ানার ধর্ম উপন্যাসে এনেছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তার শিল্প চেতনা অপ্রযুক্ত হয় নি।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের বিভিন্ন শিল্পরীতি আলোচনা করার পর আমরা দেখতে পাই "সাড়া", "যবনিকা পতন", "রাত ভ'রে, বৃষ্টি", "মন-দেয়া-নেয়া", "বাসর ঘর", "ধুসর গোধূলী" উপন্যাসে যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ বার বার দেখা যায়। "সাড়া" ও "মন-দেয়া-নেয়া" ছাড়া এই পর্বের অন্যান্য উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনে জটিল আবর্তে প্রেম নিস্পৃহ হয়েছে। বুদ্ধদেবের প্রথম পর্বের উপন্যাসের রচনাভঙ্গিতে দাম্পত্য প্রেমের বিপর্যয় দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসে বলার ভঙ্গি একটু ঢিলেঢালা, "মন দেয়া-নেয়া"

তে প্রেম বিষয়টি বলার ভঙ্গি ও গল্প করার ইচ্ছা নূতন তাৎপর্য লাভ করেছে। এই ধরনের উপন্যাসে শিল্পরীতি সার্থকতায় পৌঁছেছে।

বুদ্ধদেবের প্রেম বিষয়ক উপন্যাসে চরিত্রগুলি অভিজাত পরিবারের। নায়ক ও নায়িকা অবশ্যই কলকাতা বা ঢাকা শহরের। লেখক চরিত্রের অবাধ স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় খর্ব করেন নি। অধিকাংশ উপন্যাসে লেখক চরিত্রের প্রেমকেই বড় করে তুলেছেন, সমাজকে নয়। উপন্যাসে এই কাঠামো বজায় রাখতেগিয়ে আঙ্গিক চেতনার কোথাও বিচ্যুতি ঘটে নি। উপন্যাসে নিজস্ব ভঙ্গি তিনি আবিষ্কার করেছেন। একটি নূতন রীতিতে কথা বলার এই কৌশল উপন্যাসে বৈচিত্র্য এনেছে। "সাড়া" উপন্যাসে জীবন বিষয়ে গভীর ভাবনা দেখা যায় না। সাগরের কাম তৃষ্ণার যেন শেষ নেই। দাম্পত্য জীবন পেয়েও সাগর যেন দায়িত্বহীনভাবে কোন অজানা দেশে পাড়ি দিতে চেয়েছে বার বার।। "রাত ভ'রে বৃষ্টি" উপন্যাসের প্রথম দিকে এই রূপজ কামনা আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। কিন্ত নিজের দাম্পত্য জীবনে মালতী সুখ না পেয়ে জয়ন্তর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। পরে মালতী ভুল বুঝতে পেরে স্বামীর সংসারকেই আসল মনে করে। কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রথম পর্বের উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনে ফাটল দেখানোর পর মিলন ছিল না বললেই চলে। প্রথম পর্বের উপন্যাসে আমরা চরিত্রের ভোগী মানসিকতা, দেহজ কামনা-বাসনা ও যৌন উদ্দীপন মূলক ক্রিয়াকলাপের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায়। প্রথম পর্বের উপন্যাসে দাম্পত্য জীবন ধ্বংসের পর চরিত্রগুলির চেতনা ফিরে নি। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু বাস্তবমুখী জীবন চেতনায় চরিত্রগুলিকে অঙ্কন করেছিলেন। লেখক উপন্যাসে নায়ক, নায়িকাদের ব্যক্তিত্ব ও ঘটনার আবর্তে নূতন ভাবে তুলে ধরেছেন।

উল্লেখ পঞ্জী

১) সাহিত্য প্রকরণ / হীরেণ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক দেবাসিষ ভট্টাচার্য্য, তৃতীয় সংস্করণ পৌষ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, ১১, এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ /পৃষ্ঠা-.৮

২) বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা / সত্যেন্দ্রনাথ রায়, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ২০০০, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩ /পৃঃ ৪০

৩) ঐ পৃষ্ঠা-২২

৪) সাহিত্য তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ/ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭৩ / পৃষ্ঠা - ১৯৪।

৫) ঐ, পৃষ্ঠা- ১১৪

৬) "দেশ" (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ-শ্রাবণ যুগ্ম সংকলন সাহিত্য সংখ্যা)/পৃষ্ঠা-২০

৭) সাহিত্যের পথে ["সাহিত্যের তাৎপর্য" প্রবন্ধ] রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিক সংখা, ১৪ খণ্ড, পৃষ্টা-৩৭২

৮) মানিক গ্রন্থাবলী/চতুর্থ খণ্ড, প্রকাশক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ/ পৃষ্ঠা-২০১

৯) কল্লোল যুগ/অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/প্রকাশক- শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ নবম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৯/পৃষ্ঠা- ৮২

১০) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-৮৩

১১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-২২৬

১২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (ষষ্ঠ খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা-৩৮৮

১৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (ষষ্ঠ খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা-৪৭৮

১৪) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (ষষ্ঠ খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ৪৭৮

১৫) বুদ্ধদেব বসু / যেদিন ফুটলো কমল, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ , ৯৩ হ্যারিসন রোড, কোলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫২। / পৃষ্ঠা- ৫৩

১৬) বুদ্ধদেব বসু / যেদিন ফুটলো কমল, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ , ৯৩ হ্যারিসন রোড, কোলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫২। পৃষ্ঠা- ১১২

১৭) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (অষ্টম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ পৃষ্ঠা-৩৪৬

১৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (অষ্টম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-৩১৫

১৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (অষ্টম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-৩৭৪

২০) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ বিশাখা/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৯১

২১) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ বিশাখা/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৯১

২২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (সপ্তম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৭৪, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-১২৩

২৩) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ বিশাখা/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-১২৪

২৪) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ বিশাখা/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-১২৪

২৫) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ বিশাখা/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-১২৪

২৬) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-২২৭

২৭) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-২২৮

২৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-২০২

২৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ

আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৫৫

৩০) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ-২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা- ১২৯

৩১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ-২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা- ১৩৭

৩২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ-২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ১৩৭

৩৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ-২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা- ৭২

৩৪) ঐ /পৃষ্ঠা- ৭৩

৩৫) ঐ / পৃষ্ঠা- ৭৫

৩৬) ঐ / পৃষ্ঠা- ৮২

৩৭) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (সপ্তম খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৭৪, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-১৫৭

৩৮) ঐ / পৃষ্ঠা-১৭২

৩৯) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-২৮৭

৪০) ঐ / পৃষ্ঠা-৩৫০

৪১) ঐ / পৃষ্ঠা-৩৪৮

৪২) লাল মেঘ / ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ , ৯৩ হ্যারিসন রোড, কোলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫৩। পৃষ্ঠা - ১৩৯

৪৩) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেঁজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৫৩০

৪৪) ঐ / পৃষ্ঠা-২৪২

৪৫) ঐ / পৃষ্ঠা-২৪২

৪৬) ঐ / পৃষ্ঠা-১৯

৪৭) ঐ / পৃষ্ঠা-২৪

৪৮) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৭ম খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-১১৬

৪৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৭ম খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-১১৮

৫০) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৬ষ্ঠ খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-২০৬

৫১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৬ষ্ঠ খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-২১০

৫২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৬ষ্ঠ খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-১৪৭

৫৩) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/৭ম খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-২৭২

৫৪) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ/২য় খণ্ড/ প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ /পৃষ্ঠা-৬৬

৫৫) ৫৫) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৪০৮

৫৬) দশটি উপন্যাস/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০৪, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা-৪৫৫